চিরকালের রূপকথা

চিত্তরঞ্জন রায়

জোতি প্রকাশন ২এ, নবীনকুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
২এ, নবীনকুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীশেখর দে (ম্যানেজার)
নব যুবক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৮, নরসিংহ লেন
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

——মা-বাবার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

—খোকা

১৮শে মাঘ ১৩৬৭

ভূমিকা

আরব্য উপন্যাসের সঠিক রচনা কাল জানা যায় না। তবে এর বর্তমান রূপ গড়ে উঠেছে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে। ভালবাসা, ঘৃণা, লোভ, ঐশ্বর্য, ঈর্ষা, মমতা, স্বপ্ন, অ্যাড্‌ভেঞ্চার-ভরা জীন, পরী ও দৈত্য অধ্যুষিত এক অদ্ভুত জগতের কথা আরব্য উপন্যাস। কাহিনীগুলো আরবীতে লেখা। এর প্রথম ইউরোপীয় করেন এ্যাণ্টনিও গ্যালাণ্ড নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে।

আরব্য উপন্যাস শুধু গল্পই নয়, এতে প্রচুর শিক্ষনীয় বিষয়ও আছে।

অনেকদিন আগে পারস্যের রাজা ছিলেন সুলতান সাহরিয়ার। তিনি একবার ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা করে বসেন প্রতি সন্ধ্যায় একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করবেন আর সকাল হলে তার গর্দান নেবেন। সত্য সত্যই এক ভাবি অদ্ভুত খেয়াল। এর অবশ্য একটা কারণ ছিল। সুলতান তাঁর বেগমকে প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসতেন। একবার ঐ বেগম সুলতানের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেন। তার ফলে সুলতান সঙ্গে সঙ্গে বেগমকে মৃত্যু দণ্ড দেন এবং ঐ দিন থেকে প্রতিজ্ঞা করেন যে দেশে কোন মেয়েকে জীবিত রাখবেন না। এমনি ভাবে তাঁর অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার ফলে অসংখ্য মেয়ে প্রাণ হারালো।

অবশেষে একদিন উজির সুলতানের জন্য কোন মেয়ে জোগাড় করতে না পেরে কপাল চাপড়ে কাঁদছেন এমন সময় তাঁর কন্যা এসে বলল—বাবা কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

—সুলতানের জন্য আজ আর কোন মেয়ে পাওয়া গেল না। সকলকেই প্রায় বাদশাহ মেরে ফেলেছেন আর বাকী যারা ছিল তারা দেশত্যাগী হয়েছে। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল সুলতানের কাছে কি জবাব দেব? উজির জানালেন।

উজিরের দুই কন্যা ছিল শাহারজাদী আর দুনিয়ারজাদী। পরমা সুন্দরী ছিল তারা। আর ছিল তেমনি বুদ্ধিমতী। শাহারজাদীর ছিল

প্রচুর পড়াশুনা, তাছাড়া গল্প বলতে পারত ভারি সুন্দর। বাবাকে কাঁদতে দেখে সে বলল—কিছু ব্যস্ত হয়ো না তুমি। আমার সঙ্গে সুলতানের বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মেয়ের কথা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। তিনি জানতেন সুলতানকে বিয়ে করা মানে মৃত্যু বরণ করা। শাহারজাদীকে তিনি অনেক ভাবে বোঝালেন। সে কিন্তু বুঝতে চায় না। অবশেষে খুব ধূমধাম করে সুলতানের সঙ্গে শাহারজাদীর বিয়ে হয়ে গেল।

শাহারজাদীর রূপে সুলতান একেবারে মুগ্ধ। তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে নব বধূর দিকে তাকিয়ে থাকেন। হঠাৎ সুলতান লক্ষ্য করলেন শাহারজাদীর চোখে জল। সুলতান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কাঁদছ কেন?

—আমার কান্না পাচ্ছে ছোট বোনের কথা ভেবে। আমি তাকে প্রাণাধিক ভালবাসি। আজকের রাত আমার জীবনের শেষ রাত। কাজেই তাকে যদি শুধু আজ রাতটুকুর জন্য আমার সঙ্গে থাকতে দেন তো সুখে মরতে পারব।

—এ আর এমন কথা কী? আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি। আর কেঁদ না। সুলতান সম্মতি জানান।

সুলতানের আদেশে পাল্কিতে করে উজিরের বাড়ী থেকে দুনিয়ারজাদীকে নিয়ে আসা হল। শাহারজাদীর পাশেই দুনিয়ারজাদীর জন্য আলাদা বিছানা পাতা হল। দুবোনে খানিক গল্প হল। তারপর একসময় সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। সুলতানের পাশে শাহারজাদী শুয়ে আছে। কিন্তু ঘুম নেই তার চোখে। ভোর হবার খানিক আগেই সে হঠাৎ উঠে বসল দুনিয়ারজাদীর ডাকে—দিদি এখনো ঘুমোচ্ছ। গল্প বলবে না।

ছোট বোনের ডাকে এদিকে সুলতানেরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। সুলতানকে উঠতে দেখে শাহারজাদী বলল—ছোট বোন গল্প শুনতে চায় কারণ আজ রাতই তো আমার জীবনের শেষ রাত। যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে গল্প বলা শুরু করি।

—তাতে আর আপত্তি কী ? সুলতান সহজেই অনুমতি দিয়ে দেন।

গল্প বলা শুরু হল। সুলতানও একজন উৎসাহী শ্রোতা হয়ে পড়েন। হঠাৎ গল্পের এক চরম মুহূর্তে শাহারজাদী চুপ করল।

—কি হল থামলে কেন দিদি ? বল। ছোটবোন দিদিকে বলে।

—গল্পের শেষ যদিও আরো ভাল তবু এ গল্প শেষ করতে পারলাম না কারণ সকাল প্রায় হয়ে এসেছে। জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে।

·····গল্পটা সুলতানেরও ভাল লাগছিল। তিনিও শেষ শোনার জন্য আগ্রহী। শাহারজাদী সুলতানকে এমনি কৌতূহলী করে তুলতেই চেয়েছিল। বুদ্ধিমতী শাহারজাদী বাদশার মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বলল জাঁহাপনা কৃপা করে যদি আমায় আরেকটা দিন বাঁচতে দেন তাহলেই কাল গল্পটা শেষ কবতে পারি। সুলতান মনে মনে ভাবলেন গল্পটা শেষ করলে না হয় কালই প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেবেন তিনি। মন স্থির করে শয্যা ত্যাগ করলেন সুলতান। এমনিভাবে বাতের পর রাত শাহারজাদী সুলতানকে হাজার একটা গল্প শুনিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তিনি দুই সন্তানের জননী হয়েছেন। সুলতানও নিষ্ঠুরতা ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক মানুষে পরিণত হয়েছেন।

শাহারজাদী কথিত সেই হাজার এক গল্পের মধ্যে থেকে কয়েকটা গল্প এই বইটিতে সন্নিবেশিত হল।

— লেখক

দৈত্য রাজকন্যা ও রাজপুত্র

এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ হোসেন, মধ্যম আলি আর সর্ব কনিষ্ঠর নাম ছিল আমেদ। তাছাড়া রাজার ছিল নৌরোন্নিসা নামে একটি সুন্দরী মেয়ে। সে ছিল রাজার পালিত কন্যা।

নৌরোন্নিসা শিশু বয়সে তার বাপ-মাকে হারাবার ফলে রাজামশাই তাকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করতে লাগলেন। দিন যায়। সপ্তাহ যায়। মাস যায়। বছরও যায় কেটে। নৌরোন্নিসা তিলে তিলে বড় হতে থাকে তার রূপের ডালি নিয়ে। তার রূপের আলোয় রাজপ্রাসাদ আলোকিত হয়ে উঠল। তার রূপে রাজার তিন পুত্রই মুগ্ধ। কিন্তু তারা মনের কথা প্রকাশ করে না। রাজামশাই একদিন তাদের মনের বাসনা বুঝতে পেরে মহাভাবনায় পড়লেন। তিন পুত্রের সঙ্গে তো আর এক মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না! কাজেই তাঁর ভাবনা দিন দিন বেড়ে চলল।

শেষ পর্যন্ত অনেক ভাবনা-চিন্তার পর রাজামশাই এক উপায় স্থির করলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি তিন পুত্রকে ডেকে বললেন—তোমরা নৌরোন্নিসাকে বিয়ে করতে চাইছ কিন্তু একজনকে তো আর তোমরা সকলে মিলে বিয়ে করতে পারবে না। কাজেই আমি ঠিক করেছি, তোমাদের মধ্যে থেকে যে আমায় সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য বস্তু এনে দিতে পারবে সে-ই কেবল পাবে নৌরোন্নিসাকে। এ কাজের জন্য তোমাদের একটা বছর সময় দেওয়া হল।

রাজার কথা শুনে রাজপুত্ররা তিনটে তেজী ঘোড়ার পিঠে করে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে নিল তারা প্রচুর ধন-রত্ন।

তিন দিন ক্রমাগত চলার পর ওরা নিজেদের রাজ্যসীমানা ছাড়িয়ে অন্য এক রাজ্যে প্রবেশ করল। সেখানকার এক শরাইখানায় একদিন বিশ্রাম নিয়ে তারা স্থির করল, এখানথেকেই তারা তিনদিকে বেরিয়ে

পড়বে। তারপর বছর ঘোরার তিন দিন আগেই যে যার আশ্চর্য বস্তু সংগ্রহ করে এখানে এসে আবার মিলিত হবে। তারপর একত্রে তারা নিজেদের রাজ্যে ফিরে যাবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তিন রাজপুত্র সরাইখানা ছেড়ে তিন দিকে বেরিয়ে পড়ল। অনেক বন-জঙ্গল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত আর মরুভূমি পেরিয়ে প্রায় তিন মাস পর বড় রাজকুমার হোসেন এসে পৌঁছল এক অজানা রাজ্যে। রাজ্যের নাম বিশনগর। সেসময়ে এ রাজ্যের প্রচুর নামডাক ছিল। হোসেন একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে বস-বাস করতে শুরু করল। আর রোজ বাইরে শহরে পথে-ঘাটে, দোকানে-দোকানে ঘুরে বেড়াতে লাগল যদি চোখে তেমন কোন আশ্চর্য জিনিস পড়ে যায়!

দিন কয়েক ঘোরাঘুরির পর রাজকুমার বুঝল রাজ্যের সুনাম মোটেই মিছামিছি নয়। পথের দুধারে যেমন সব বিরাট বিরাট অট্টালিকা তেমনি সুন্দর সাজানো দোকান-পাট। তাতে রয়েছে হাজার হাজার দামী জিনিসের পসরা—যা সে ইতিপূর্বে কোনদিনও চোখে দেখেছে বলে মনে পড়ে না!

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তার দিকে ঈশ্বর মুখ তুলে যেন তাকালেন। পথে যেতে যেতে হঠাৎ হোসেন দেখতে পেল একজন ফেরিওয়ালা হাঁকছে—কার্পেট চাই, কার্পেট। আশ্চর্য কার্পেট।

হোসেন থমকে দাঁড়াল। তারপর ফেরিওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল—আশ্চর্যের কী আছে তোমার কার্পেটে?

—এই কার্পেটের ওপর বসে আপনি যেখানে যত দূরেই যেতে চান না কেন, কার্পেট মুহূর্তের মধ্যে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে। াম মাত্র চল্লিশ মোহর।

—চল্লিশ মোহর!

—হ্যাঁ। নেবেন নাকি কার্পেটটা?

হোসেন কার্পেটওয়ালার কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেল। রাজা-মশাইকে সত্যি এবার ও একটা আশ্চর্য বস্তু দেখাতে পারবে। মনে মনে

খুশি হলেও সে মুখে বলল—তোমার কথা যে সত্যি তার প্রমাণ দিতে পার ?

—নিশ্চয়ই।

এই বলে ফেরিওয়ালা রাস্তার উপর কার্পেটটা বিছিয়ে দিল। কার্পেটটা বেশ বড়। জন চার-পাঁচ মানুষ সহজেই বসতে পারে। কার্পেটটা বিছিয়ে ফেরিওয়ালা বলল—বসুন এবার।

দুজনেই বসল। হোসেন আর ফেরিওয়ালা।

ফেরিওয়ালা কার্পেটের উপর বসে বলল—কোথায় যাবেন, বলুন ?

—আমার বাড়ীতে। হোসেন গম্ভীরভাবে জবাব দিল।

অমনি কার্পেটটা চোখের নিমেষে আকাশ পথে উড়ে হোসেনের বাড়ী অর্থাৎ যেখানে সে উঠেছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। হোসেন খুব খুশি হল কার্পেটের কেরামতি দেখে। আর সঙ্গে সঙ্গে ফেরিওয়ালাকে চল্লিশটা মোহর দিয়ে কার্পেটটা কিনে ফেলল। হোসেন এত বেশী খুশি হয়েছিল যে, সে ফেরিওয়ালার প্রাপ্য চল্লিশটা মোহর ছাড়া আরও দুটো মোহর বেশী দিল।

কিন্তু তখনও বছর শেষ হতে অনেক দেরি। তাই আরো কিছুদিন সে ঐ নগরে থেকে যাওয়া মনস্থ করল।

ইতিমধ্যে মেজকুমার আলি পারস্যের সিরাজনগরে পেঁ ৗছে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করতে শুরু করেছে। সিরাজনগরের খ্যাতি তখন লোকের মুখে মুখে। আলির ধারণা ছিল কখনও কখনও কোন আশ্চর্য বস্তুর সন্ধান মেলে, তা কেবল মাত্র সিরাজনগরেই মিলবে। কাজেই সে আহারের ও নিদ্রার সময়টুকু ছাড়া বাকী সময়টুকু আশ্চর্য বস্তুর সন্ধানেই থাকে। এমনিভাবে সন্ধানে থাকতে থাকতে সত্যি সত্যি সে একদিন এক আশ্চর্য জিনিসের সাক্ষাৎ পেল। একদিন সে দেখল, এক ফেরিওয়ালা গজদন্তের তৈরি চোঙার মত একটা দুরবীণ বিক্রি করবার জন্য পথে হাঁক দিয়ে চলেছে। কিন্তু মূল্য অসম্ভব রকম বেশী। একটা গজদন্তের দুরবীণের যা ন্যায্য মূল্য হওয়া উচিত তার অনেকগুণ বেশী দাম চাইছে ফেরিওয়ালাটা। আলি শেষ অবধি অবাক হয়ে

ফেরিওয়ালাকে ডেকে বললে—তুমি সামান্য একটা গজদন্তের দূরবীণের দাম এত বেশী চাইছ কেন? এর দাম তো তিন মোহরের বেশী কোন রকমেই হওয়া উচিত নয়।

ফেরিওয়ালা বললে—নিশ্চয়ই এমন একটা কারণ আছে যার জন্য আমি এত বেশী দাম চাইছি। আপনার ধারণা হয় তো এ দূরবীণটা একটা খেলনা মাত্র। কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। এতে চোখ রেখে আপনি যে কোন জায়গা থেকে আপনি যা দেখতে চাইবেন তাই দেখতে পাবেন।

—বটে! বলে আলি দূরবীণটা চোখের উপর তুলে ধরে তার পিতাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তারপরই চোখের উপর ভেসে উঠল পিতার মুখ আর তাঁর রাজসভা।

তারপর সে নৌরোন্নিহারকে দেখার কথা চিন্তা করতেই দেখতে পেল তাকে ফুল বাগিচায় সখীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দূরবীণের কেরামতি দেখে খুশি হয়ে আলি ফেরিওয়ালাকে বলল—সত্যি ভারি অদ্ভুত দূরবীণ তো তোমার। এই নাও তোমার দাম। এই বলে পঞ্চাশটা মোহর ফেরিওয়ালার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে মনে মনে ভাবল আর কে তাকে পায়। নৌরোন্নিহার এখন থেকে তারই কারণ দূরবীণের চেয়ে আর আশ্চর্য বস্তু কোন রাজকুমারের পক্ষেই আনা সম্ভব নয়।

এদিকে ছোট রাজকুমার আমেদও একটা আশ্চর্য জিনিস সংগ্রহ করে ফেলেছে। সে গিয়েছিল অনেক দূরের এক শহরে। শহরের নাম সমরখন্দ। সমরখন্দ তখন বেশ সমৃদ্ধশালী শহর বলে পরিগণিত হত। শিল্প ও ধন-দৌলতে তার তুলনা ছিল না। আমেদও তাই বুকে নেক আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়ে সেখানে গিয়েছিল।

সমরখন্দে পৌঁছে আমেদ সারাদিনই প্রায় বাজারের পথে-ঘাটে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ঘুরে বেড়াত। এমনিভাবে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে দেখল, একজন ফলওয়ালা পথের ধারে বসে ফল বেচছে। আমেদ ঘুরতে ঘুরতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিল। সে

ফলওয়ালার কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা নাসপাতি তুলে দাম জিজ্ঞেস করতে ফলওয়ালা যে দাম চেয়ে বসল শুনে আমেদের তো চক্ষু চড়কগাছ! সে নাসপাতিটার দাম হেঁকে বসল—পঁয়ত্রিশটা মোহর। লোকটা বলে কী! সে কী পাগল হয়ে গেছে নাকি! একটা সামান্য নাসপাতির দাম পঁয়ত্রিশ মোহর! দাম শুনে আমেদ ফলওয়ালাকে হেসে বলল—ওহে তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? একটা মামুলি নাসপাতির দাম পঁয়ত্রিশ মোহর!

ফলওয়ালা খানিক আমেদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—নাসপাতির কোন বিশেষ গুণ না থাকলে কি আর আমি এমনি এমনি দাম চাইছি।

এর গুণ অনেক। যদি কোন মরণাপন্ন রোগীর নাকের কাছে নাসপাতিটা ধরা হয় তাহলে রোগী চোখের নিমেষে রোগ মুক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে সক্ষম হবে।

আমেদ তখন বলল—তোমার কথার সত্যতা যদি প্রমাণ করতে পার তাহলে এ ফল আমি এখনই কিনে ফেলব।

ফলওয়ালা বলল—নাসপাতির কথা সমরখন্দের সকলেই জানে। কারণ এ ফলটি বহু প্রাচীন। এখন যিনি ফলটির মালিক তিনি এই ফলের গন্ধ শুঁকিয়ে সমরখন্দের বহু মরণাপন্ন রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন। কিন্তু ভদ্রলোক শুধু তার আর্থিক অসংগতির জন্য ফলটি বেচে দেবার মতলবে আমায় খানিক আগে দিয়ে গেছেন।

আমেদ কয়েকজন পথচারির কাছে জিজ্ঞেস করে ফলওয়ালার কথার সত্যতার প্রমাণ পেয়ে উপযুক্ত মূল্যে নাসপাতিটা কিনে নিল।

তারপর দিনই আমেদ তার তল্পি-তল্পা গুটিয়ে সেই সরাইখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল—যে সরাইখানা থেকে একদিন তিন ভাই তিন দিকে রওনা হয়েছিল। পথে যেতে যেতে সে ভাবল তার অন্যান্য ভাইরা কখনই তার মত অবাক করা জিনিস সংগ্রহ করতে পারবে না, কাজেই নৌরোন্নিহার যে তারই হবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

যথা সময়ে সরাই খানায় তিন ভাই এ দেখা হল। তারপর কে কি

এনেছে তাই নিয়ে আলোচনা শুরু হল। বড় রাজকুমার তার কার্পেটটা বার করে বলল—এই কার্পেটে চড়ে যে কেউ তার ইচ্ছে মত যে কোন যায়গায় যেতে পারে এক নিমেষে। আলি বলল—দাদা তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তো এর গুণের কথার তুলনা হয় না। তবে আমি যে দূরবীণটা এনেছি, এতে চোখ রেখে সারা দুনিয়ার যা কিছু যেখানকার দেখতে চাইবে তাই দেখতে পাবে।

হোসেন কৌতূহলী হয়ে দূরবীণটা চোখের উপর তুলে ধরে নৌরোন্নিসাকে দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করতে সে রাজপ্রাসাদের একটা ঘরে রোগ শয্যায় শায়িত। চোখ মুখ ফ্যাকাসে, মৃত্যু পথ যাত্রী। তার মাথার কাছে কয়েকজন লোক আর রাজ বৈদ্য দাঁড়িয়ে। হোসেনের হাবভাব লক্ষ্য করে আলি প্রশ্ন করল—কী হয়েছে দাদা? তোমাকে অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

হোসেন ক্ষীণ কণ্ঠে বলল যার জন্য আমাদের এত পরিশ্রম, সেই নৌরোন্নিসা রোগ শয্যায়। মনে হচ্ছে ওর আর বাঁচার কোন আশা নেই। এই দেখো!

হোসেনের কাছ থেকে দূরবীণটা নিয়ে বাকি দুই ভাই নৌরোন্নিসার অবস্থা দেখে নিল। তারপর আমেদ বলল—কোন চিন্তা নেই দাদা, আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে যার দ্বারা যে কোন রোগীকে অচিরে ভাল করা যায়—রোগ যত কঠিনই হোক না কেন, এই দেখ সেই জিনিস।

এই বলে আমেদ তার আশ্চর্য নাসপাতিটা বের করে দেখাল সবাইকে, হোসেন এবার বলল—আর দেরি নয়। এবার আমার কার্পেটে চড়ে চল সবাই ফিরে চলি রাজপ্রাসাদে।

অতঃপর তারা তিনজনে ঐ মজার কার্পেটে চড়ে স্বদেশ অভিমুখে পাড়ি দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা নৌরোন্নিসার রোগ শয্যার পাশে এসে হাজির হল। নৌরোন্নিসার তখন অন্তিম অবস্থা। চক্ষু মুদ্রিত। নিথর নিস্পন্দ দেহ। আমেদ নিমেষের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে নৌরোন্নিসার নাকের কাছে নাসপাতিটা ধরতেই সে চোখ মেলে তাকাল। তারপর

ধীরে ধীরে এক সময় শয্যার উপর উঠে বসল। মনে হতে লাগল, এই মাত্র বুঝি সে ঘুম ভেঙ্গে উঠেছে।

রাজামশাই নৌরোন্নিসার আরোগ্য লাভের কথা শুনে খুব পুলকিত হয়ে উঠলেন। পুত্রেরা আগাগোড়া সব কথাই সবিস্তারে জানাল তাঁকে। রাজা মশাই ইতিপূর্বে এমন আশ্চর্য তিনটি জিনিস চোখে দেখেননি বা কারুর মুখে কখনও শোনেন নি।

এরপর হোসেন বিনয় সহকারে বলল—বাবা, এবার ভেবে দেখুন, আমার কার্পেটটা না থাকলে নৌরোন্নিসার প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হত না কখনই। কারণ এত তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছতে না পারলে নৌরোন্নিসারকে জীবিত দেখতে পেতাম না। আমেদের নাসপাতিও অমন অবস্থায় কোনই কাজে লাগত না। সুতরাং নৌরোন্নিসার সঙ্গে একমাত্র আমারই বিয়ে হওয়া সম্ভব।

আলিও নাছোড় বান্দা। সে বলল—আপনি ভেবে দেখুন বাবা, যদি আমার দূরবীণটা না থাকত তাহলে নৌরোন্নিসার অসুখের সংবাদ পেতামই না। সে ক্ষেত্রে দাদার কার্পেট কিংবা আমেদের নাসপাতি কোনই কাজে লাগত না। নৌরোন্নিসা শেষ অবধি মারা যেত। কাজেই এক্ষেত্রে নৌরোন্নিসার উপর আমার অধিকার বেশী।

সব শুনে আমেদ বলল—সবার কথাই জানি কিন্তু বাবা, আমার নাসপাতি না থাকলে কি আর নৌরোন্নিসাকে বাঁচান যেত? কাজেই···

আমেদের কথা শেষ হল না! রাজা মশাই বললেন—সবই শুনলাম আর বুঝলাম। আমার বিবেচনায় নৌরোন্নিসার প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাদের সংগ্রহ করা তিনটি জিনিসই সমানভাবে কাজে লেগেছে। কাজেই এক্ষেত্রে তোমাদের কারুর সাথেই নৌরোন্নিসার বিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। একজনের সঙ্গে বিয়ে দিলে আরেকজনের মনে দুঃখ হবে। কাজেই এবার তোমাদের অন্য রকম পরীক্ষা দিতে হবে। এবার তীর ছোঁড়ার পরীক্ষা। তোমাদের মধ্যে যার তীর সবচেয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হবে সে-ই পাবে নৌরোন্নিসাকে।

এ প্রস্তাবে তিন জনেই রাজী হয়ে গেল।

প্রথমে তীর ছুঁড়ল বড় রাজকুমার হোসেন। অ-নে-ক দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল তার তীর। তারপরের পালা আলির। আলির তীর হোসেনের তীরকে ছাড়িয়ে গেল। এবার ছুঁড়ল আমেদ তার যথা শক্তি দিয়ে। কিন্তু তীরটা যে কোথায় গিয়ে পড়ল কেউ তার খোঁজ পেল না। আশ্চর্য কাণ্ড। রাজামশাই-এর লোক লস্করেরা অনেক খোঁজা খুঁজি করেও ঐ তীরের কোন সন্ধান পেল না। আমেদ কিন্তু দমবার পাত্র নয়। তীরের সন্ধান তার চাই-ই। অত বড় তীরটা তো আর পাখা গজিয়ে আকাশে উড়ে যায় নি। যেমন করে হোক এর একটা কিনারা খুঁজে বের করতেই হবে। অগত্যা আমেদ নিজে বেরিয়ে পড়ল তীর খুঁজতে। যেমন করে হোক তীর সে খুঁজে বের করবেই তাতে তার যত কষ্টই হোক। তীর খুঁজতে খুঁজতে আমেদ শেষকালে মাইল কয়েক দূরে একটা পাহাড়ের নীচে এসে তীরটা খুঁজে পেল। মনে মনে সে খুব অবাক হয়ে গেল। কোন মানুষের পক্ষে এত দূর তীর নিক্ষেপ করা কি সম্ভব? কিন্তু তাই যদি বা না হয় তাহলে সে তীরটা এত দূরে ছুঁড়লই বা কী করে? এমনি সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে লক্ষ্য করল পাহাড়টার গায়ে একটা লোহার দরজা রয়েছে। দরজাটা বন্ধ। আমেদ কৌতূহলী হয়ে উঠল। পাহাড়ের গায়ে কিভাবে দরজা এল আর বন্ধই বা কেন? কোন লুকান ধনরত্ন নেই তো ওর মধ্যে? আমেদ এমনি সব নানা কথা ভাবে আর পায়ে পায়ে দরজাটার দিকে এগোতে থাকে। দরজার কাছে পেঁৗছতেই দরজাটা আপনা থেকে খুলে গেল। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায় আমেদ। তারপর উন্মুক্ত তরোয়াল হাতে ধীরে ধীরে অন্ধকার গুহার মধ্যে এগোতে থাকে। ভয় কাকে বলে রাজপুত্র জানে না। বেশ খানিকটা যাবার পর অন্ধকার অনেকটা হাল্কা হয়ে এল। আরো—আরো সে এগিয়ে চলল। তারপর এক্ সময় আমেদ একটা প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর দরজার সামনে এসে পৌঁছল। এ প্রাসাদ তাদের প্রাসাদের চেয়েও ঢের বড়। চারিদিকে আলোয় আলোকিত। আমেদ ঐ রাজবাড়ীর দরজার কাছে পৌঁছে দেখল একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে সুন্দর দামী পোশাক পরে তার দিকেই এগিয়ে

আসছে। মেয়েটি তার ঠিক সামনে এসে সরাসরি বলল—এসো রাজকুমার আমেদ। মেয়েটির মুখে সে তার নাম শুনে ভারি অবাক হয়ে গেল। মেয়েটি তার নাম জানল কি করে?

মেয়েটি পুনরায় বলল—অবাক হয়ে যাচ্ছ খুব, তাই না? আমি তোমার নাম কি করে জানলাম? আমি হলাম দৈত্যরাজের কন্যা কাজেই আমি তোমাদের সকলকেই চিনি এবং তাদের নামও জানি।

আমেদ অবাক বিস্ময়ে মেয়েটির সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি গড় গড় করে বলে চলে—নৌরোন্নিসাকে বিয়ে করার আশায় যে তীরটা তুমি ছুঁড়েছিলে সেটাকে এখান পর্যন্ত আমিই টেনে এনেছিলাম শুধু তোমার সাথে দেখা করব বলে। কিছুদিন পূর্বে তোমায় দেখে তোমার রূপে আমি এত মুগ্ধ হয়েছি যে তোমায় বিয়ে করতে চাই। এখন তোমার মতামত জানালেই খুশি হব।

আমেদ অবাক হয়ে মেয়েটির কথা শুনছিল। এমন সুন্দরী মেয়ে তাকে বিয়ে করতে চায় এতে আর তার কি আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু এ কথা যেন সে কিছুতে মুখ দিয়ে ব্যক্ত করতে পারছে না। মেয়েটি ঘাড় দুলিয়ে জিজ্ঞেস করল—কি গো কথা বলছ না কেন? রাজী তো?

আমেদ ঘাড় নেড়ে তার সম্মতি জানায়। তারপর হেসে প্রশ্ন করে—তোমার নাম কী?

মেয়েটি বলল—আমার নাম পরীবানু। এস আমার সাথে।

পরীবানু আমেদকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। বাড়ীর ভিতরটা দেখে আমেদ আরো অবাক হয়ে গেল। ইতিপূর্বে এমন সুশোভিত বাড়ী আর কখনও দেখে নি। যাক্ তিন দিন পরে আমেদের সঙ্গে পরীবানুর খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। কি করে যে দুটো মাস কেটে গেল আমেদ টেরই পেল না। যখন হুঁশ হল, বাড়ীর জন্য মন উতলা হয়ে উঠল। পরীবানুকে এ কথা জানাতে সে বলল—তুমি বাড়ী যাবে তাতে আর আমার আপত্তির কি আছে তবে তুমি চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে। তাড়াতাড়ি চলে এস। আর আমার কথা

কিংবা আমার বাড়ীর ঠিকানা কাউকে জানিও না তাহলে সাংঘাতিক বিপদ ঘটতে পারে।

এই পরীবানু আমেদকে রাজবেশে সাজিয়ে সঙ্গে সান্ত্রি সেপাই দিয়ে নিজের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল। রাজধানীতে পৌছলে পথের দু'ধারের লোক তাকে আনন্দে হাত তুলে অভিনন্দন জানাতে লাগল। মাস কয়েক ছোট রাজকুমারের কোন সংবাদ না পেয়ে প্রজারা সব মুষড়ে পড়েছিল। হঠাৎ তাকে রাজার বেশে দেখে তাই এত হৈ চৈ। রাজা-মশাই খবর পেয়ে রাজবাড়ীর সদর দরজায় ছুটে এলেন। দীর্ঘ দিন পুত্র অদর্শনে তিনি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন কারণ আমেদকে তিনি বড়ই ভালবাসতেন।

তারপর ভিতরে নিয়ে গিয়ে রাজামশাই আমেদের কাছে আদ্যোপান্ত খবর জানতে চাইলেন। সেও পরীবানুর কথামত প্রকৃত খবর লুকিয়ে রেখে বলল—বাবা, তীর ছোঁড়ার পর যখন তীরটা হারিয়ে গেল তখন সেটা খুঁজতে খুঁজতে দূরে একটা পাহাড়ের ধারে এসে তীরটা কুড়িয়ে পেলাম। আর সেই থেকে আমার ভাগ্য পরিবর্তন হল। আমি বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দেই আছি। এর বেশী তুমি আর আমার কাছে কিছু জানতে চেও না। আমি এখন যেখানে আছি সেখানে আমাকে থাকতে দাও। মাঝে মাঝে শুধু এসে তোমাদের সকলকে দেখে যাব।

রাজা মশাই বললেন—বেশ তাই হবে না-হয়। তুমি যেখানে আছ সেখানে যদি সুখে থাক তাতে আর আমার আপত্তি কি আছে? তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে এলেই সুখী হব।

তিন দিন পরে আমেদ আবার ফিরে গেল পরীবানুর কাছে?

আমেদ পরীবানুর সঙ্গেই থাকে শুধু মাসে একবার করে মা বাবাকে দেখতে আসে। যখনই সে মা-বাবার কাছে আসে পরীবানু তাকে নতুন নতুন রাজবেশে সাজিয়ে দেয়। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হল। রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রী আমেদের ঐশ্বর্যের হিংসায় জ্বলে উঠল। তারা সবাই রাজা মশাইকে গিয়ে বোঝাল—ছোট রাজকুমারের ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হয় তিনি পিতার ঐশ্বর্যের উপর টেক্কা দিতে চান। কাজেই যে

ছেলে তার পিতার সঙ্গে রেশারেশি করে সে যে ভবিষ্যতে মহারাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি ?

রাজা মশাই বললেন—অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। আপনারা সকলে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন।

মন্ত্রীরাও পিছু হটার পাত্র নন। তারা বিপুল উৎসাহে বললেন—এ কথা সকলেই জানে ছোট রাজকুমারের সঙ্গে নৌরোন্নিসার বিয়ে না দিয়ে মেজ রাজকুমারের সঙ্গে দিচ্ছেন। কাজেই এ কথা কি বলতে চান যে এব জন্য ছোট রাজকুমারের আপনার প্রতি কোন আক্রোশই নেই। আর তাছাড়া ছোট রাজকুমার তাঁর ঠিকানাই বা কেন দিচ্ছেন না ? এমন কি তিনি সঙ্গে যেসব সেপাই নিয়ে আসেন তাদের চেহারা দেখলে বুঝতে পারা যায় যে তাদের কাছে আমাদের সেপাইরা পিপিলিকার মত। সুতরাং এটাও স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ছোট রাজকুমার অর্থবল ও শক্তি দুই-ই দেখাতে চান। এখনও যদি আপনি ছোট রাজকুমারের মনের কথা বুঝতে না পারেন তাহলে আর কি করে বোঝাব ?

রাজামশাই মন্ত্রীদের কথা শুনে এতক্ষণে একটু ভাবিত হলেন। তাঁর কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল। মনে মনে ভাবলেন, মন্ত্রীরা সবটাই ভুল বলে নি। ছোট রাজকুমারের আচরণে তিনি যেন অশুভ একটা ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন। সে যেন নৌরোন্নিসাকে হারানোর ফলে তাঁর রাজ্য একদিন আক্রমণ করে বসবে না এমন কথা হলপ করে কেউ বলতে পারে না।

রাজামশাই অনেক ভেবে চিন্তে অবশেষে এক যাদুকরীকে তলব করে পাঠালেন। সে এলে তাকে বললেন—তুমি হয়তো শুনেছ আমার ছোট ছেলে মাসে একবার করে এসে আবার চলে যায়। সে কোথায় থাকে আর কি করে জেনে আমায় যত শীঘ্র সম্ভব জানাও।

কিছু দিনের মধ্যে যাদুকরী আমেদ ও পরীবানুর খবর সংগ্রহ করে রাজাকে জানালো যে, দৈত্য কন্যার শক্তিতে আমেদ এখন যথেষ্ট বলশালী। সে পরীর কথায় যে কোন দিন রাজ্য আক্রমণ করতে পারে। কাজেই রাজা মশাই-এর এবিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকা উচিত।

রাজা মশাই মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন তিনি আমেদের কাছে এমন একটা অসম্ভব জিনিস চাইবেন যা পরীদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আর যদি তা পরীরা সংগ্রহ করে দেয়, তাহলে পরের বার আমেদের কাছে আরো অসম্ভব এমন একটা বস্তু চেয়ে বসবেন যা পরী কেন কোন দেবতার পক্ষেও যোগাড় করা সম্ভব নয়। তখন আমেদ রাজামশাইকে তাঁর ঈপ্সিত বস্তু জোগাড় করতে না পেরে লজ্জায় আর তার কাছে মুখ দেখাতে আসবে না।

পরেরবার আমেদ যখন এল, রাজা মশাই তাকে ডেকে বললেন— আমি জানি তুমি আমায় খুব শ্রদ্ধা কর, এবং এই জন্যই তুমি যথেষ্ট সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা সত্বেও আমায় দেখবার জন্যে ছুটে আস। আমি জানতে পেরেছি তুমি পরীর অনুগ্রহ পেয়েছ। তাদের অনুগ্রহ সচরাচর মানুষ পায় না। কাজেই এই সুযোগে যদি তোমার পরী-স্ত্রীর কাছ থেকে আমার জন্য হালকা একজন মানুষ বয়ে নিয়ে যাবার মত তাঁবু অথচ তার ভিতর আমার সমস্ত সৈন্য থাকতে পারবে—যদি এনে দিতে পার তাহলে খু-উ-ব খুশি হব।

রাজামশাই এর কথা শুনে মনে মনে আমেদ বিরক্ত হলেও মুখে বলল—পরীকে গিয়ে তাই বলব আর যদি জোগাড় করতে না পারি তাহলে ইহজীবনে এ মুখ আর আপনাকে দেখাব না।

আমেদ ফিরে গেল দৈত্যপুরীতে। পরীবানুকে আদ্যপান্ত ঘটনার কথা জানাল। সে সব কথা শুনে বলল—আমার এ ধরণের কয়েকটা তাঁবু আছে। একটা নিয়ে গিয়ে বাবাকে দিয়ে এস।

পরদিনই আমেদ একটা থলিতে করে তাঁবু নিয়ে রাজামশাইকে দিল। রাজামশাই তো অবাক! একটা সামান্য থলিতে এমন একটা তাঁবু রয়েছে যাতে তাঁর সহস্র সহস্র সৈন্য সামন্ত ধরবে। যাই হোক তাঁবুটা খাটানো হলে তার বিশাল আকৃতি দেখে রাজামশাই আর তাঁর হিংসুক মন্ত্রীদের মুখ শুকিয়ে উঠল—চক্ষু ছানা বড়া!

মন্ত্রীরা রাজামশাইএর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—দেখছেন

আপনার পুত্রবধূর অশেষ ক্ষমতা। এবার আপনার রাজ্য বাঁচানো যাবে না!

আবার শুরু হল শলা পরামর্শ। এবার কী চাওয়া যায় আমেদের কাছে? অনেক ভেবে রাজামশাই আমেদকে ডেকে বললেন—তাঁবুটি পেয়ে আমি কত যে খুশি হয়েছি তা আর তোমায় কী বলব। পরী-বউকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিও। আর বলো, আমি এমন একজন লোক চাই যার উচ্চতা হবে এক হাতেরও কম, মুখে থাকবে কুড়ি হাত দীর্ঘ দাড়ি আর হাতে থাকবে দশ মণ ওজনের লোহার একটা গদা।

সব শুনে আমেদ বলল—এমন একটা লোক যদি আমি আপনার কাছে এনে উপস্থিত করতে পারি তাহলে আপনার কাছে আবার আসব নচেৎ জীবনে আর কোনদিনও এমুখ আর দেখাব না।

এই বলে বিদায় নিল আমেদ।

রাজপুরীতে ফিরে গিয়ে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা পরীবানুর কাছে ব্যক্ত করল চিন্তিত আমেদ। ওর কথা শুনে পরীবানু বলল—তোমার বাবা তাঁর শঠ মন্ত্রীদের কুমন্ত্রণায় এই সব অসম্ভব জিনিস চাইছেন।

—কেন? বিস্মিত আমেদ তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল।

পরীবানু উত্তরে জানাল—তিনি আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না। শুধু তাই নয় তিনি মনে প্রাণে তোমার অমঙ্গল চান। কারণ তিনি ভেবে বসে আছেন তুমি তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবে।

যাই হোক তিনি যেমন ক্ষুদে মানুষ চেয়েছেন ঠিক তেমনটি পাবেন।

—কি করে তা সম্ভব হবে?

—আমার এক ভাই আছে ঠিক ঐ রকমই, তাকেই পাঠিয়ে দেব তোমার বাবার কছে।

এই বলে আমেদের স্ত্রী ঘরের এক কোণে একটু আগুন জ্বেলে তাতে কি যেন একটা জিনিস ছড়িয়ে দিতেই ঘরময় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারপর সেই ধোঁয়া ধীরে ধীরে সরে গেলে বিস্মিত আমেদের চোখের সামনে ফুটে উঠল বদখত চেহারার এক হাতের চেয়েও ছোট্ট একটা

মানুষ। তার দাড়ি লম্বায় কুড়ি হাত আর হাতে একটা মস্ত লোহার গদা। আমেদ ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এল। এমন অদ্ভুত লোক সে জীবনে কখনও দেখে নি।

পরীবানু বামন লোকটাকে ডেকে বললেন— আমার শ্বশুর অর্থাৎ এঁর বাবা তোমায় দেখতে চেয়েছেন। তুমি আমার স্বামীর সঙ্গে সেখানে যাও। কিন্তু সাবধানে থেকো কারণ মন্ত্রীদের কুমন্ত্রণায় রাজামশাই তোমায় বিপদে ফেলতে পারেন।

যাই হোক আমেদ বামনটিকে নিয়ে বাবার কাছে রওনা হয়ে গেল। আমেদ যখন রাজপ্রাসাদে পৌঁছল, রাজামশাই তখন সভাসদদের নিয়ে রাজসভায় বসে আছেন। বামনটার বদখত চেহারা দেখে সভার সকলে ভয়ে আঁৎকে উঠল। বোনের মুখে রাজা ও তাঁর পাত্রমিত্রের কথা শুনে বামন মনে মনে খুব চটেছিল। সে রোষকষায়িত নয়নে রাজামশাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল— আমায় তোমার দেখবার শখ হয়েছে না কি?

বামনের অদ্ভুত আকৃতি আর কথাবার্তা শুনে রাজামশাই মনে মনে খুব ভয় পেয়ে গেলেও কোনরকম লজ্জিত কণ্ঠে বললেন— বাজে কথা বল না। আমি এখানকার রাজা। রাজার সঙ্গে কি করে ব্যবহার করতে হয় জান না কি? কথা না শুনলে কারারুদ্ধ করব। বামন রাগে গর্ গর্ করতে করতে বলল— আমায় কারারুদ্ধ করবে! তার আগে তোমায় শেষ করে ফেলব।

যেমন কথা তেমনি কাজ। সে তার লোহার ভারি গদার আঘাতে রাজামশাই-এর মাথা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল। বিপদ দেখে মন্ত্রীরা পালাতে উদ্যত হলে তাদেরও গদার আঘাতে বামনটা যমের দুয়ারে পাঠিয়ে দিল।

তারপর পরীবানুর ক্ষুদে ভাই আমেদের সঙ্গে আবার পরীবানুর রাজপুরীতে ফিরে এল। বাবার মৃত্যুতে আমেদ খুব মুষড়ে পড়েছিল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে পরীবানু বলল— পিতার মৃত্যু সত্যি খুব দুঃখজনক। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে তোমার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে, জেনে রেখো।

দৈত্য ও সওদাগর

অনেক অ-নে-ক দিন আগের কথা তখন আরব দেশে এক ধনী সওদাগর বাস করত। আরব দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তার কারবার। কারবারের তাগিদে তাকে প্রায়ই সেই সব জায়গায় যেতে হত। একবার ঐ সওদাগর চলেছেন বাগদাদ অভিমুখে। সঙ্গে খাদ্য হিসাবে তিনি নিয়েছেন কিছু শুকনো খেজুর আর রুটি।

সকালের ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় সওদাগর বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে। ক্রমে মাথায় উপর সূর্যের তেজ বাড়তে লাগল আর পায়ের তলায় বালিও ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে। উঃ কী গরম! সওদাগরের জিভ শুকিয়ে আসতে লাগল প্রচণ্ড পিপাসায়। শরীর যেন আর চলে না। সঙ্গের উটটাও বিশ্রাম চায়। ব্যাকুলভাবে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে সওদাগর হঠাৎ দেখল অদূরে একটা খেজুর কুঞ্জ। ওটা নিশ্চয়ই একটা মরুদ্যান। ঝরণার জলও তবে মিলতে পারে ওখানে। সওদাগর ছুটে চলে মরুদ্যানের দিকে। সুন্দর একটি মরুদ্যান। স্বচ্ছ জলের ঝরণা বালির বুক চিরে আঁকা বাঁকা পথে বয়ে চলেছে। খেজুর গাছের ছায়া পড়েছে ঝর্ণার স্বচ্ছ জলে। সওদাগর খেজুর গাছের শীতল ছায়ায় বসে ঝর্ণার জলে হাত মুখ ধুয়ে নেয়। তারপর ঝুলি থেকে রুটি আর খেজুর বার করে আহার শুরু করে দেয়। উটটাও দিব্যি চারপাশের সবুজ নরম ঘাস ছিঁড়ে খেতে লাগল।

খেজুর খেতে খেতে খেজুরের বীজগুলো সওদাগর আনমনে এদিক ওদিক ছুড়ে ফেলছিল। এক সময় খাওয়া সেরে অঞ্জলি ভরে ঝরণার জল পান করে সওদাগর তৃপ্ত হয়। এমন সময় হঠাৎ সে দেখতে পেল তার কাছ থেকে খানিক দূরে মাটির বুক থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ঝড় না কি? সওদাগর চমকে উঠলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ধোঁয়া উড়ে গিয়ে দেখা দিল এক বিরাট দৈত্যের মূর্তি। হাতে তার মস্ত চক চকে একটা খাঁড়া।

দৈত্যকে দেখে তো সওদাগর ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। খাঁড়াটা সওদাগরের মাথার উপর তুলে ধরে বলল—শয়তান, তুই আমার ছেলেকে মেরে ফেললি কেন? এবার তুই মরবার জন্য প্রস্তুত হ!

—সে কী! সওদাগরের গলা কেঁপে ওঠে। কোন রকমে কম্পিত কণ্ঠে সে বলল—আমি আপনার ছেলেকে মারলাম কখন? তাকে তো জীবনে কখন দেখিও নি।

—মারিস নি? এই মাত্র তুই খেজুর খাচ্ছিলি না?

—হ্যাঁ। কিন্তু খেজুর···

—ঐ খেজুরের বীজ যখন তুই চারদিকে ছুঁড়ে মারছিলি তখন আমার ছেলে ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছিল। তোর ছোড়া একটা খেজুরের বীজ তার চোখের মধ্যে ঢুকে যায়। আর তার ফলেই সে মারা গেছে। তোকে আজ আর আমি ছাড়ছি না।

বেচারী সওদাগর বুঝল এ যাত্রা আর তার রেহাই নেই। মৃত্যু নিশ্চিত। তবু মৃত্যুর পূর্বে বাঁচবার শেষ চেষ্টা হিসাবে সওদাগর দৈত্যের পা জড়িয়ে ধরে বলল—মরতে যখন হবেই, আমার বিষয় সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে মরতে দিন। এর জন্য এক বছরের সময় চাই আপনার কাছে।

—হ্যাঁ। বড় বোকা পেয়েছিস আমায়। তোকে ছেড়ে দিই আমি আর তুই বেমালুম সরে পড়। ও সব চালাকি চলবে না আমার সঙ্গে। এক্ষুনি তোকে খতম করব। তাছাড়া তুই যে আবার ফিরে আসবি তার বিশ্বাস কী? সওদাগর অশ্রু সিক্ত কণ্ঠে বলল—বিশ্বাস করুন, খোদার কসম বলছি আমি এক বছর পরে ঠিক এখানটিতে ফিরে আসব। আমার কথার কোন নড়চড় হবে না। সওদাগরের চোখের জলে হয় তো দৈত্যের মন ভিজেছিল। সে রাজি হয়ে গেল সওদাগরের প্রস্তাবে।

—যা, কিন্তু ভুলে যাস নি এক বছর পরে আবার এখানে ফিরে আসতে হবে। দেখিস কথা যেন ঠিক থাকে।

কথা রেখেছিল সওদাগর।

বাড়ী পৌঁছে বিষয় আশয়ের বিলি ব্যবস্থা করতে করতেই একটা

বছর কেটে গেল। গরীবদের দান খয়রাত করে স্ত্রী পুত্রের জন্য ধন-দৌলত গচ্ছিত রেখে সে তার নির্দিষ্ট দিনে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মরুদ্যানে ফিরে গেল। মরুদ্যানে পৌঁছে একটা খেজুর গাছের তলায় বসে সওদাগর দৈত্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সেখানে এক বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হল। সঙ্গে তার সোনার শেকলে বাঁধা সুন্দর একটি হরিণী। সওদাগরকে গাছ তলায় ম্লান মুখে বসে থাকতে দেখে বলল—এখানে একা এমন করে বসে আছেন কেন? এখানে একটা দুষ্ট দৈত্য বাস করে জানেন না?

—ঐ দৈত্যের কবলেই তো পড়েছি ভাইসাব। সওদাগর সমস্ত ঘটনা জানাল বৃদ্ধকে।

এমন অদ্ভুত ঘটনার কথা বৃদ্ধ জীবনে কখনও শোনে নি। সওদাগরের মত এমন সত্যবাদী লোকও সে কোন দিনও দেখে নি। আল্লা কি তার প্রতি কোন দয়া করবেন না? দেখতে হবে খোদাতালার বিচারটা। বৃদ্ধ তার হরিণের শিকল ধরে সওদাগরের পাশে বসে পড়ল।

একটু পরে আরেকজন বৃদ্ধ এল সেখানে। তার সঙ্গে এক জোড়া কালো কুকুর। দ্বিতীয় বৃদ্ধও মনোযোগ দিয়ে সওদাগরের দুঃখের কাহিনী শুনল। তারপর আল্লার বিচার দেখবার জন্য তার পাশে কুকুরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বসে পড়ল।

সে বসতে বসতে আরো একটা বৃদ্ধ এসে হাজির। সঙ্গে একটা খচ্চর। কৌতূহলী হয়ে সেও ওদের পাশে বসে পড়ল। নিজেদের মধ্যে আলাপ পরিচয় চলছে। দূরে সওদাগর একাকী বসে মনে মনে খোদার নাম স্মরণ করছে। এমন সময় হঠাৎ চারিদিকে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। কিছুই দেখা যায় না সেই অন্ধকারে তারপর এক সময় ধোঁয়ার মধ্যে থেকে একটু একটু করে ফুটে উঠল এক বিরাট দৈত্য। হাতে তার ঝকঝকে ধারালো খাঁড়া।

সওদাগর প্রাণভয়ে আল্লার নাম জপ করে চলেছে। দৈত্যটা তার দিকে এগিয়ে এসে বলল—সত্যি তাহলে তুই কথা রেখেছিস।

—এসেছি হুজুর। বিনীতভাবে সওদাগর জানাল।

সওদাগরের অবস্থা দেখে তিনটি বৃদ্ধেরই করুণা হল। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একটা মতলব স্থির করে ফেলল। তারপর প্রথম বৃদ্ধ বুকে সাহস এনে বলল—খাঁড়াটা একটু নামান। আমাদের একটা কথা আছে।

— তোরা আবার কে? দৈত্য আকাশ ফাটানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

—পথচারী আমরা। বৃদ্ধরা দৈত্যকে জানাল।

—কি বলতে চাস বল্। দৈত্য প্রথম বৃদ্ধকে বলল হেঁড়ে গলায়।

— হুজুর সওদাগরকে মারার আগে আমার আর এই হরিণীর গল্প শুন্নুন। যদি গল্প ভাল লাগে তবে সওদাগরের শাস্তির তিন ভাগের এক ভাগ মকুব করতে হবে।

— বেশ তাই হবে। দৈত্য খাঁড়াটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল।

প্রথম বৃদ্ধের কথা ফুরোতে না ফুরোতে দ্বিতীয় বৃদ্ধ দৈত্যকে সেলাম জানিয়ে বলল— আমারও একটা নিবেদন আছে হুজুরের কাছে।

— বল্ কি বলতে চাস।

— আমার এই কুকুর দুটোর একটা ভারি অদ্ভুত গল্প আছে। গল্প শুনে আপনার ভাল লাগলে সওদাগরের শাস্তির এক তৃতীয়াংশ ক্ষমা করতে হবে।

— কি রে ব্যাটা তুইও কিছু বলবি না কি? তৃতীয় বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে দৈত্য হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

হ্যাঁ-সেই জন্যই তো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

— বল্ তাড়াতাড়ি বলে ফেল সবুর আর সইছে না।

— আমারও সেই একই আবেদন হুজুর। আমার এই খচ্চরের বিষয়ে একটা সুন্দর কাহিনী আছে। শুনে ভাল লাগলে হতভাগ্য সওদাগরের শাস্তির এক তৃতীয়াংশ মকুব করতে আজ্ঞা হোক।

— সবই বুঝলাম, এখন গল্পটা আরম্ভ করলে বাঁচি।

প্রথম বৃদ্ধের দিকে খটমটিয়ে তাকিয়ে দৈত্য বলল। সঙ্গে সঙ্গে এও বলল গল্পগুলো ওর যদি ভাল না লাগে তো বৃদ্ধ তিন জনের প্রাণ যাবে। ওর প্রস্তাবে তিন বৃদ্ধতেই রাজী হয়ে গেল! গল্প হল শুরু।

প্রথম বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে তার কাহিনী বলতে লাগল—এই যে হরিণীটি দেখছেন দৈত্যরাজ আসলে কিন্তু এটা একটা হরিণ নয়। এটি আমার স্ত্রী।—সে কি! তুই মানুষ ছেড়ে হরিণ বিয়ে করলি কেন?

—হরিণ বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে। বিয়ে করেছিলাম একটি সুন্দরী মেয়েকেই। গল্পটা শুনুন আগে।

ধর্মকে সাক্ষী করে বিয়ে করেছিলাম একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে। কিন্তু সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি অর্থাৎ আমার স্ত্রীর কোন পুত্র সন্তান হয় নি। বিয়ের পর দেখতে দেখতে ছটা বছর কেটে গেল। কিন্তু এত দিনের মধ্যেও কোন ছেলেমেয়ে হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই দেখে আত্মীয় স্বজনদের অনুরোধে আবার একটা বিয়ে করলাম। কিন্তু এবার ঈশ্বর মুখ তুলে তাকালেন। একটি সুন্দর ছেলের জন্ম হল।

প্রথম পক্ষের স্ত্রী গোড়া থেকেই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অর্থাৎ তার সতীনকে দেখতে পরত না। তারপর যখন ছেলে হল তখন তো তার হিংসায় ফেটে পড়ার অবস্থা হল। এদিকে আমি ব্যবসা নিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই। মেয়েলি ঝগড়া ঝাঁটির তেমন কোন খবর রাখি না। ইতিমধ্যে প্রায় বছর খানেকের জন্য বিদেশে যেতে হল।

শয়তানী প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সেই হল মস্ত সুযোগ।

ছেলেবেলা থেকেই সে যাদু বিদ্যা রপ্ত করেছিল। এবার যাদু বিদ্যা প্রয়োগ করল আমার ছেলে আর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ওপর। মন্ত্র বলে সে তাদের একটি গরু আর বাছুরে পরিণত করল। তারপর বাড়ীর রাখালকে বলে তাদের অন্যান্য গরুর সঙ্গে মাঠে চরতে পাঠাত। আব সোনার খাট ছেড়ে তাদের স্থান হল নোংরা গোয়াল ঘরে।

এক বছর পরে ফিরে এসে ছেলে-বৌকে দেখতে না পেয়ে বড় বৌকে জিজ্ঞেস করলাম তাদের কথা। সে বলল, বিবি না কি কিছু দিন রোগ ভোগ করে হঠাৎ মারা গেছে এবং ছেলে সেই শোকে দেশত্যাগী হয়েছে।

এরপর থেকে বড়ই দুঃখের মধ্যে দিন কাটতে লাগল। ইতিমধ্যে বকরীদ এসে পড়ল। এই পরবে ভাল গাই কুরবানি দিলে খুব পুণ্য

হয়। তাই রাখালকে গরু আনতে বললে সে যে গরুটা নিয়ে এল তাকে কুরবানি করতে ছুরি তুলতেই সে মানুষের মত এমন করুণভাবে মুখের দিকে তাকাতে লাগল যে মনের মধ্যে দয়া হল। তারপর তার চোখ বেয়ে ঝরতে লাগল তপ্ত অশ্রু। চোখের জল দেখে ছুরি চালাতে আর মন চাইল না।

এদিকে বড় বিবি সবই দেখছিল। সে বলল—আল্লাকে খুশি করতে হলে এখনি সুন্দর নধর গরুকে কুরবানি দেওয়া উচিত। দয়া করে রাখালকে আর অন্য গরু আনতে বল না।

বিবির কথামত গরুটাকে জবাই দিলাম কিন্তু তার চামড়া ছাড়িয়ে কয়েকটা হাড় ছাড়া তেমন মাংস পাওয়া গেল না। অবশেষে রাখালকে আরো একটা গরু আনতে বললাম। বড় বিবি আর রাখাল এবার যে গরুটাকে নিয়ে এল সেটা একটা নধর ছোট ষাঁড়। কি সুন্দর নাদুস নুদুস চেহারা তার! এমন জিনিস থাকতে ওরা অমন বাজে গরু নিয়ে এল কেন?

কিন্তু যেই ষাঁড়টাকে জবাই করবার জন্য ছুরি তুলেছি ওমনি সেটা আমার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দুচোখে তার করুণ চাহনি আর ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। বুকটা তখন কেমন করে উঠল। ছুরি বসাতে পারলাম না ওর গলায়।

বড় বৌ বার বার অনুরোধ করতে লাগল জবাই করার জন্য কিন্তু যতবারই জবাই করার জন্য ছুরি তুলি ততবারই ষাঁড়টা আমার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অবশেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বড় বৌকে বললাম, এই ষাঁড়টাকে পরের বছরের জন্য রেখে দেওয়াই ভাল তখন বরং আরো একটু বড় হবে।

, ষাঁড়টাকে গোয়ালে রেখে অন্য একটা গরু নিয়ে এসে জবাই দেবার পর ঈদ্ সেবছরটা বেশ ভাল ভাবেই কেটে গেল। এরপর কয়েকদিন পরে একদিন রাখাল আমায় আড়ালে ডেকে বলল সে তার জাদুকরী কন্যার কাছ থেকে শুনেছে গরুটা তার ছোট বৌ এবং ষাঁড়টা তার ছেলে।

রাখালের কাছে ঘটনাটা শুনে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। শেষ অবধি বড় বৌ-এর পাল্লায় পড়ে নিজের হাতে আমি আমার ছোট বৌকে হত্যা করলাম। একদিন রাখালকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম তার মেয়ের কাছে। মেয়েটিকে দেখতে ভারি সুন্দর। সে আমার অনুরোধে জানাল যে সে সহজেই আমার ছেলেকে ষাঁড় থেকে আবার মানুষ করে দিতে পারে যদি আমি তার দুটি সর্ত রক্ষা করি। প্রথম সর্ত হল, তার সঙ্গে ছেলের বিয়ে আর দ্বিতীয় সর্ত হল, বড় বৌকে তার ইচ্ছামত শাস্তি দেওয়া।

রাখালের মেয়ের কথায় রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু একটা অনুরোধ তাকে করলাম সে যে শাস্তিই দিক অন্ততঃ বড় বৌকে প্রাণে না মারে —এমনিতেই তো ছোট বৌ-এর মৃত্যু হয়েছে আমার হাতে।

রাখাল কন্যা মন্ত্র আউড়াতে লাগল। তারপর মন্ত্রপূত জল ষাঁড়টার গায়ে ছড়িয়ে দিতেই দেখতে দেখতে সে মানুষে রূপান্তরিত হল। সামনে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার ছেলে দুটো পা জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করল। আমার চোখে জল এসে পড়ল। যাইহোক ছেলেকে ফিরে পেয়ে কিছুদিনের মধ্যে ধুমধাম করে ছেলের সঙ্গে রাখাল কন্যার বিয়ে দিয়ে দিলাম। বিয়ের পর সে তার কথামত বড় বৌকে জাদুর সাহায্যে এক মুহূর্তে হরিণী করে ফেলল।

সেই থেকে হরিণীটিকে আমার সঙ্গে সঙ্গে রেখেছি। কথা হয়েছে রোজ সকালে হরিণীকে দশ ঘা বেত মারতে হবে। এই দেখছেন না, সেই বেত আমার হাতে।

কয়েক বছর পরে আমার সোনার ছেলে যে কোথায় চলে গেল বুঝতে পারলাম না। তার সন্ধানেই হরিণী সঙ্গে করে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর তাছাড়া বড় বিবিকে সঙ্গে রাখতে হয়েছে কারণ তার শাস্তি নিয়মিত দিয়ে যেতে হবে তো।

এই হল আমার ইতিহাস হুজুর। এবার বলুন এ কাহিনী অদ্ভুত কি না?

—তা বটে, গল্পটা তোর সত্যি ভাল। আমি এই সওদাগরের

শাস্তির তিনভাগের এক ভাগ মকুব করে দিলাম। দৈত্য হাসতে হাসতে বলল।

এবার দ্বিতীয় বৃদ্ধ উঠে বলল—হুজুর এখন আমার গল্পটা শুনুন।

—বল। তবে গল্পটা যেন ভাল হয় কিন্তু······ দৈত্য বলল।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ শুরু করল--আমার বাবার ছিল চালানি কারবার। আরবের নানা ছোট বড় শহরে চালানি জিনিসের ব্যবসা করে আমাদের দিনগুলো মোটামুটি ভালভাবে কেটে যাচ্ছিল। কোন দুঃখ কষ্ট ছিল না সংসারে।

আমরা তিন ভাই—সবার ছোট ছিলাম আমি। ব্যবসা করতে বাবার কাছে আমরা সবাই শিখেছিলাম। মৃত্যুর সময় তিনি প্রত্যেককে এক হাজার করে টাকা দিয়ে বলে গিয়েছিলেন যে বুদ্ধি খরচ করে ব্যবসা করতে পারলে ঐ থেকেই সুখ উথলে উঠবে।

হাতে অর্থ পেয়ে আমার দুই ভাই ব্যবসা করার জন্য বিদেশে চলে গেল। আমি ছোট বলে বাড়ীতে থেকে গেলাম ঘর-সংসারের দায়িত্ব নিয়ে। আর বাড়ী বসে বুদ্ধি খাটিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করলাম। ব্যবসায় আয় মন্দ হয় না।

এক বছর পরে একদিন এক ভিক্ষুক এসে হাজির। তাকে সবে বলতে যাচ্ছিলাম ভিক্ষে হবে না। খেটে খাও। এমন সময় আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ভিক্ষুক আর কেউ নয় আমার বড় ভাই। আমায় দেখে বড় ভাই উচ্চকণ্ঠে কেঁদে উঠল। আর বলল, বাবা যা দিয়ে গিয়েছিলেন ব্যবসা করতে গিয়ে সব গেছে। এখন একেবারে সে ভিখিরী। তাছাড়া সে আরো বলল যে সে আমার কাছে গায়ে গতরে খেটে দুবেলা দুমুঠো খাবে শুধু—পয়সা কড়ি ওর মোটেই চাই না।

বড়ভাই-এর কষ্ট দেখে মনে মনে বড় দুঃখ হল। ঘরের ভিতর ডেকে এনে তাকে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করলাম। ভাই এর ব্যবসার নেশা তখনও যায় নি। ব্যবসা করে আমার যে দু'হাজার টাকা হয়েছিল তার থেকে হাজার টাকা ভাইকে দিয়ে দুজনে মিলে মিশে ব্যবসা করতে শুরু করলাম। লাভও মোটামুটি হতে শুরু করল।

কিন্তু বছর ঘুরতেই দেখি আমার মেজভাইও এসে উপস্থিত। তার অবস্থা আরো শোচনীয়। তাকে মোটেই চেনা যায় না। পাগল বলে প্রায় তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু পরিচয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাকেও ঘরে তুললাম। তাকেও হাজার টাকা দিলাম ব্যবসা করতে।

এতদিনে তিন ভাই আবার এক সঙ্গে মিলিত হলাম। বাড়ীতে যেন উৎসব লেগে গেল। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই দিন কাটতে লাগল। কিন্তু বারটা মাস কাটতে না কাটতে ভাইদের মাথায় আবার বিদেশে গিয়ে ব্যবসা করার ইচ্ছে জাগল। ওরা বলল, ঘরে বসে টুকটাক ব্যবসা করলে বছরে হয়তো হাজার টাকাই লাভ হবে কিন্তু দূর দেশে গিয়ে ব্যবসা করলে কোটিপতি হওয়া এমন কোন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার নয়।

আমি তাদের অনেক বোঝালাম। বছর খানেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোন রকমে ওদের বাড়ীতে রাখলাম কিন্তু এরপর আর ওদের আটকানো সম্ভব হল না। ওরা আমাকেও সঙ্গে নিতে চায় কারণ আমি না কি ভাগ্যবান।

অগত্যা আমাকেও ওদের সঙ্গে যেতে হল। কিন্তু বিদেশে বেরোবার আগে হিসেব করে দেখলাম, আমার সবশুদ্ধ দশ হাজার টাকা আছে। মোট টাকার অর্ধেকটা বাড়ীতে মাটির তলায় পুঁতে রেখে মালপত্র কিনে জাহাজে করে আমরা বিদেশ রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

—কী হল তারপর? জাহাজ ডুবল না কি? দৈত্য জিজ্ঞেস করল।

—না তেমন কিছু ঘটে নি। তবে, দুই ভাই উঠে গেছে। আমি উঠলেই জাহাজ ছাড়ে এমনি সময় একটি সুন্দরী মেয়ে এসে পড়ল জাহাজ ঘাটায়। এসেই সে আমার পা দুটো জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে।

—কেনরে, তাকেও নিয়ে যেতে হবে কেন? উৎসুক দৈত্য দ্বিতীয় বৃদ্ধকে প্রশ্ন করল।

সে না কি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে। জাহাজে তাকে বিবি করে

তুলে না নিলে আমাদের সামনেই সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে।

দেখতে শুনতে সুন্দরী তার উপর বিপদে পড়েছে। কাজেই তাকে শেষ পর্যন্ত বিবি করেই জাহাজে তুলে নিলাম।

বিবি করার পর তাকে নতুন সাজে সাজালাম। বিবি যখন বড় ভাইদের আশীর্বাদ নিতে গেল তখন ওরা দায়সারা গোছের আশীর্বাদ করে মুখ গোমড়া করে রইল। আমার বিয়েতে তারা মোটেই খুশি নয়। সমুদ্রের নীল ঢেউ আর আসমানের পাখি দেখে হুজুব আমাদেব দুজনের দিন কাটতে লাগল। এদিকে আমার ভাইরা আমায় এড়িয়ে একান্তে বসে কি সব পরামর্শ করে। প্রথম প্রথম ভাবতাম, ওরা বুঝি ব্যবসা সংক্রান্ত কোন শলা পরামর্শ করছে। কিন্তু আমার সে বিশ্বাস এক রাত্রে ভেঙ্গে গেল। নিশ্চিন্তে আমি ও বিবি ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হল আমি যেন জলেব তলায় তলিয়ে যাচ্ছি। হয়তো একেবারে পাতালেই গিয়ে ঠেকতাম এমন সময় মনে হল কারুর কোলে শুয়ে প্রচণ্ড বেগে জলের উপর ভেসে উঠেছি। কান দুটোর ভিতর শোঁ শোঁ শব্দ হতে লাগল। অবশেষে এক সময় জল ছেড়ে ঐ কোলের মধ্যে শুয়েই আকাশ পথে উড়ে চললাম। ভয়টা একটু কাটতে দেখলাম পরীর কোলে শুয়ে আমি শূন্যে উড়ে চলেছি। পরীর মুখটা বড় পরি-চিত বলে মনে হতে লাগল। সম্বিৎ ফিরে এলে দেখলাম—পরী আর কেউ নয় আমার সদ্য বিবাহিতা বিবি।

ইত্যবসরে আমরা একটা দ্বীপে এসে নামলাম। পরীর কাছে শুনলাম সব ঘটনার কথা। সে আসলে মানুষ নয়—পরী। ওরা আগে থেকে সব কিছু বুঝতে পারে তাই সমুদ্রযাত্রায় আমার বিপদ ঘটতে পারে জেনে আমায় ও রক্ষা করতে এসেছিল। কি জানি কেন আমায় দেখে তার খুব মায়া হয়েছিল তাই সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে জাহাজঘাটায় এসেছিল এবং আমায় বিয়ে করার জন্য বারংবার অনুরোধ করেছিল। কারণ ওভাবে না এলে আমার ভাইদের হয়তো অর উপর সন্দেহ হত। ভাইদের চক্রান্ত সে আগে থেকেই টের পেয়েছিল। তাই রাত্রে

জেগেছিল নিঃশব্দে। দুই ভাই মিলে আমাদের দুজনকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বিবি পরীর রূপ ধরে আমায় এই দ্বীপের বুকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু দুই ভাইএর উপর বিবি খুব খাপ্পা। সে ওদের খুন না করে কিছুতেই ছাড়তে রাজী নয়। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য ওকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু ভাইদের খুন করতে বারবার নিষেধ করলাম। নিষেধ সে কিছুতেই শুনবে না। প্রতিশোধ সে নেবেই। যাই হোক অনেক অনুরোধ করার পর সে তাদের কতকটা ক্ষমা করল।

—তাই না কি? কিন্তু ভাইদের প্রতি তোর বড্ড টান দেখছি যে!

--তা হুজুর, যাই হোক রক্তের একটা টান আছে তো।

যাই হোক পরী আমায় মুখে কিছু না বলে একেবারে দেশে উড়িয়ে নিয়ে এল। এসে দেখলাম গুপ্তধন ঠিক জায়গাতেই আছে। এমন কি যে সমস্ত মালপত্র নিয়ে জাহাজে রওনা হয়েছিলাম সেগুলোও পরীর কৃপায় আমার গুদামে ফিরে এসেছে ঠিকমত।

সবই ঠিকমত কিন্তু একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম বাড়ীতে। বাড়ীর মধ্যে দুটো কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুকুরগুলো আমায় দেখেই আমার পদলেহন করতে লাগল। এগুলো আবার কোথা থেকে এলো ভেবে অবাক হয়ে গেলাম। এমনি সব সাত-পাঁচ ভাবছি এমন সময় আমার পরীবিবি এসে হাজির। সে কুকুরদুটোর দিকে তাকিয়ে বলল— ওদের চিনতে পারছ না বুঝি? ওরা হল তোমার দুই ভাই। তোমার কথা রাখতে পারলাম না। ওদের ক্ষমা করা গেল না। পাপীর শাস্তি হওয়া চাই ভগবানের রাজ্যে। তাই প্রাণে না মেরে ওদের দশ বছরের জন্য কুকুর করে দিলাম।

পরী শূন্যে মিলিয়ে গেল এই বলে। দশ বছর কেটে গেছে আজো সেই পরীর সাক্ষাৎ পেলাম না। তাই ওদের সঙ্গে নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি যদি তার কোথাও সন্ধান পাই।

—তা ঐ বদভাইগুলোর জন্য এত মাথা ব্যথা কেন তোর? দৈত্য প্রশ্ন করল।

— কি করব হুজুর, যতই হোক ওরা আমার চেয়ে বয়সে বড়, গুরুজন, যখন তখন পায়ের উপর এসে গড়াগড়ি খায়, হাত পা চাটে এটা কি ভাল দেখায় ? এই বলে বৃদ্ধ কেঁদে ফেলে। তারপর আবার সে বলল— আর একটা বছর দেখব। পরীর দেখা না পেলে কিংবা ভাইদের মানুষে পরিবর্তন করতে না পারলে এ জীবন আর রাখব না। আত্মহত্যা করব।

গল্প শেষ করে বৃদ্ধ উদাস দৃষ্টি মেলে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দুচোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। ধীরে ধীরে কুকুরদুটোর দেহে হাত বুলিয়ে দেয়।

মন ভিজে আসে দৈত্যেরও। সে বলল— তুই সত্যি খুব বিশ্বাসী।

— আর আমার গল্পটা কেমন লাগল বললেন না তো ?

— ভারি চমৎকার। তোরও আর্জি মঞ্জুর হল। সওদাগরের সাজার তিনভাগের এক ভাগ মাফ করলাম। ব্যাটার ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

এবার এগিয়ে এসে দাঁড়ালো তৃতীয় বৃদ্ধ— হুজুর আমার গল্পটা শুনবেন না ?

— নিশ্চয়। বল শিগগির। দৈত্যের মনে গল্প শোনার নেশা ধরেছে।

শুরু হল তৃতীয় বৃদ্ধের গল্প : হে দৈত্যরাজ, আমার সঙ্গে এই যে, খচ্চর দেখছেন, এ আসলে আমার সুন্দরী বিবি। পৃথিবীতে এর মত সুন্দরী আর কেউ আছে কি না জানি না। বেশ আনন্দে দিন আমার কাটছিল।

একবার একটা বিশেষ কাজে মাস দুয়ের জন্য বাড়ীর বাইরে যেতে হয়েছিল। কাজ সেরে দেশে ফিরছি— সঙ্গে বিবির উপহারের জন্য কত সব দামী দামী জিনিস পত্র। মনে মনে ঠিক করেছিলাম বিবিকে দামী উপহার দিয়ে একেবারে অবাক করে দেব। অবাক করার মতলবে নিঃশব্দে বাড়ীতে ঢুকলাম। চুপি চুপি শয়ন কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজা বন্ধ কিন্তু জানালা খোলা। নিঃশব্দে দরজার গোড়ায়

দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরেই শুনতে পেলাম ঘরের ভিতর দুটি লোক কথা বলছে—একটি আমার স্ত্রী অপরটি একজন পুরুষ। পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে মোটেই অসুবিধা হল না—ও যে আমারই কাফ্রি ভৃত্য আরসাদের কণ্ঠস্বর। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। কান পাততেই শুনতে পেলাম, ওরা আমায় মেরে ফেলার পরামর্শ করছে। ওরা ঠিক করেছে আমি ফিরে এলে আমায় আরসাদ হত্যা করবে। ওদের কাণ্ডকার-খানা দেখে মনটা হঠাৎ বিগড়ে গেল। চিৎকার করে উঠলাম আরসাদ দরজা খোল।

দরজা খুলে আমায় দেখতে পেয়েই আরসাদ চক্ষের নিমেষে ছুটে পালিয়ে গেল। চমকে উঠেছিল আমার বিবিও। কিন্তু সে হঠাৎ অঞ্জলিভবে মন্ত্রপূত জল এনে আমার দেহে ছড়িয়ে দিল ঘরের খোলা জানলা দিয়ে আর দেখতে দেখতে আমি হয়ে গেলাম একটা কুকুর। তারপব বিবি একটা ঠ্যাঙা নিয়ে আমাকে তাড়া করতে আমি ঘর ছেড়ে প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে গেলাম। ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির হলাম এক কসাইখানায়। সেখানে কসাই মাংস কাটতে ব্যস্ত ছিল। দোকানের আশে পাশে মাংসের অনেক হাড়গোড় আর নাড়ি-ভুঁড়ি পড়েছিল। সেগুলো খেতে খেতেই কসাইএর পোষা কুকুরগুলো আমার দিকে তেড়ে এল। আমাদের চিৎকার শুনে কসাইও ছুটে এল লাটি হাতে।

এমন সময় কসাই-এর মেয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল।

—মেরো না বাবা কুকুরটাকে। ওটা একটা মানুষ। মেয়ে বলে উঠল।

—তাই না কি?

—হ্যাঁ, এবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখ তো। এই বলে মেয়েটি খানিকটা মন্ত্র পড়া জল ছিটিয়ে দিল আমার দেহে। তার জাদুর শক্তিতে আমি আবার মানুষ হয়ে গেলাম। তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বিবির সবকথা বললাম। বিবির ব্যাপার শুনে মেয়েটি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল।

অমন স্ত্রীলোকের শাস্তি হওয়া উচিত। এই নিন এক ঘটি মন্ত্রপূতঃ জল। জলটা আপনার শয়তান বিবির গায়ে ছিটিয়ে যা তাকে হতে বলবেন তাই হয়ে যাবে।

জল নিয়ে ছুটলাম বাড়ী। আমাকে আবার মানুষ হয়ে আসতে দেখে বিবি তো অবাক! আমার লালবর্ণ চক্ষু দেখে বিবি কাঁদতে কাঁদতে আমার পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইতে লাগল। কিন্তু তাকে কোন ক্ষমা না করে মন্ত্র পড়া জল ছিটিয়ে বললাম—শয়তানী, তুই খচ্চরী হয়ে থাক আজ থেকে।

আমার সুন্দরী বিবি নিমেষের মধ্যে কুৎসিত জন্তুতে পরিণত হল। এই সেই খচ্চরী। সেই দিন থেকে ও আমায় পিঠে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে আর কোন বেচাল দেখলে ওর পিঠে নির্মম চাবুক চালাই।

—বেশ করেছিস তুই। যেমন কর্ম তেমনি ফল! দৈত্য বিজ্ঞের মত বলল।

—এবার বলুন হুজুর গল্পটা আপনার কেমন লাগল।

—খু-উ-ব ভাল গল্প তোর। যা ব্যাটা সওদাগর এর জন্য তোর শাস্তির শেষ তিন ভাগের একভাগও মকুব হয়ে গেল। এবার পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে শিগগির বাড়ী ফিরে যা।

দৈত্যের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে সওদাগর ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেল। আবার সেই আকাশ ছোঁয়া কালো ধোঁয়া সৃষ্টি করে দৈত্য অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবার তিন বৃদ্ধকে নিয়ে সওদাগর দেশের পথ ধরল। ওদের জন্যই এ যাত্রায় সওদাগরের প্রাণটা রক্ষা হয়েছে। কাজেই প্রাণ ভরে ভোজ না দিলে চলবে। সারা পথ সওদাগর ওদের ধন্যবাদ জানাতে লাগল।

বৃদ্ধরা সওদাগরের কথায় বলল—এত ধন্যবাদ জানাবার কি আছে এতে? ইমানদার মানুষের প্রতি আল্লার কোন অবিচার হতে পারে না। খোদাই আপনাকে রক্ষা করেছেন। তিনি যে অসীম দয়াবান।

তিন কন্যার কাহিনী

[হাজার এক রাতের গল্পমালার এইটিই শেষ গল্প। উজির কন্যা শাহারজাদী তার গল্পের ঝুলির শেষ গল্পটা বলে বাদশাকে গল্প বলা শেষ করে। বাদশার কানে তখনও হয়তো গল্পের রেশ লেগে ছিল। গল্প-গুলো শুনে তাঁর হৃদয় থেকে নিষ্ঠুরতা মুছে গিয়ে স্নেহ মমতার ফল্গুধারা প্রবাহিত হতে শুরু করল]

অনেক দিন আগের কথা। পারস্য দেশে তখন খসরু শা নামে এক প্রজাবৎসল সুলতান ছিলেন। তিনি প্রায়ই ছদ্ম বেশে উজিরকে সঙ্গে নিয়ে নগর পরিক্রমায় বেরুতেন। এমনি একদিন নগর পরিক্রমা শেষ করে সুলতান প্রাসাদে ফিরে আসছেন। সঙ্গে উজিরও আছেন। রাত তখন গভীর। চারিদিক নিশুতি। এক দীন দরিদ্রের কুটিরের পাশ দিয়ে তাঁরা চলেছেন এমন সময় হঠাৎ সুলতান শুনতে পেলেন কয়েকটি মেয়ে কথা বলছে। এই নির্জন রাতে মেয়েগুলো কি নিয়ে আলোচনা করছে? কোন কু-অভিসন্ধি নেই তো ওদের? সুলতান কান পাতলেন। জানালা দিয়ে উঁকিও মারলেন একবার। উঁকি দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন তিনটি প্রায় সমবয়সী মেয়ে। দেখে বোন বলে মনে হয়। ওদের মধ্যে সবার ছোটটি আবার সুন্দরী। এত সুন্দরী মেয়ে সুলতান এমন স্থানে দেখতে পাবেন বলে ভাবেন নি।

ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বড়টি বলছে—দোকানের রুটি এত বিশ্রী যে আমার মোটেই রোচে না। সুলতানের রুটিওয়ালাকে যদি বিয়ে করতে পারতাম তাহলে কী ভালই না হত!

তাই শুনে মেজ বোনটি বলল—ও কী তুই বলছিস দিদি? আমি তো সুলতানের বাবুর্চিকে বিয়ে করতে পারলে বর্তে যাই। তাহলে বাবুর্চির হাতের সুন্দর সুন্দর খাবার ছাড়া এ বাড়ির বাজে খাবার আর খেতে হত না।

ওদের কথা শুনে ছোটটি কিন্তু কোন কথা বলল না।

—কি রে তোর বুঝি কিছু ইচ্ছে করে না? বড় বোন জিজ্ঞেস করল।

—করবে না কেন? তবে আমার কথা শুনে তোমরা সব হাসবে। আমার ইচ্ছা, আমি সুলতানের বেগম হব।

সুলতান নিঃশব্দে কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বাড়ীটা চিনে নিয়ে ফিরে এলেন প্রাসাদে। সকাল হলে সুলতান উজিরের সঙ্গে পাল্কি পাঠিয়ে দিলেন তিন বোনকে রাজদরবারে নিয়ে আসার জন্য। ওরা তিন বোন সুলতানের হুকুমে রাজদরবারে এসে উপস্থিত হল। সুলতানের ভয়ে তখন ওদের বুক শুকিয়ে গেছে। এবার হয় তো কোন অনিচ্ছাকৃত অন্যায়ের জন্য ওদের গর্দান যাবে। সুলতান মুহূর্তের জন্য ওদের তিন বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমাদের কি মনের ইচ্ছা আমায় বল আমি তা পূরণ করব।

তিন বোন চুপ করে থাকে। সুলতানের সামনে ওরা কি বলবে? মনের ইচ্ছা কি সুলতানের কাছে প্রকাশ করা যায়।

—বল তোমার কি ইচ্ছা? বড়টির দিকে তাকিয়ে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন এবারও কোন জবাব নেই। সুলতান শেষে একটু হেসে বললেন—কাল রাত্রের কথা তোমাদের সব শুনেছি। তুমি আমার রুটিওয়ালাকে বিয়ে করতে চাও তো?

বড় বোন লজ্জায় ও ভয়ে চুপ করে থাকে।

—বল, ঠিক বলছি তো আমি?

—হ্যাঁ। মুখ নিচু করে থাকে বড় বোন।

অবশেষে মেজ বোন এবং ছোট বোনকেও সুলতানের কাছে তাদের অদ্ভুত মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে হয়।

সুলতান সকলেরই ইচ্ছা পূরণ করলেন। অর্থাৎ বড় বোনের বিয়ে দিলেন তাঁর রুটিওয়ালার সঙ্গে, মেজ বোনের বিয়ে দিলেন বাবুর্চির সঙ্গে আর ছোট বোনকে করলেন রাজরাণী।

সুলতানের এই ন্যায় বিচারে রাজ্যের সকলেই খুশি। ছোটোর রূপে

গুণে তার মিষ্টি ব্যবহারে সুলতান নিজেও খুব মুগ্ধ। কিছু দিনের মধ্যেই ছোট বেগম সুলতানের প্রধানা বেগম হয়ে পড়ল। এক বছর পরে ছোট বেগমের মা হবার লক্ষণ দেখা দিল। সারা রাজ্যে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। এদিকে হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল বড় দুই বোন। বাইরে কিন্তু ওরা তা মোটেই প্রকাশ করল না। মনে মনে শুধু পরিকল্পনা আঁটতে লাগল কি করে ছোট বোনকে সুলতানেব চোখে হেয় করা যায়। সুলতানের সম্মতি নিয়ে বড় দুই বোন ছোট বেগমের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হল। এবং মনে মনে মতলব আঁটা হয়ে গেছে ওদের।

সন্তান যেদিন ভূমিষ্ঠ হল সুলতান খবর পেলেন, ছোট রাণী একটা মরা কুকুরের বাচ্চা প্রসব করেছেন।

আসলে কিন্তু তাঁর হয়েছিল সুন্দর ফুটফুটে একটা ছেলে। যেমনই তার গায়ের রং তেমন তার চাঁদের মত চেহারা। ওরা দুই বোন মিলে সুকৌশলে ছেলেটাকে একটা মাটির হাঁড়িতে করে নদীব জলে ভাসিয়ে দিল। আর আগে থেকে সংগ্রহ করা একটা কুকুরের মৃত বাচ্চা দেখিয়ে সুলতানের মন বিগড়ে দিল। রাগে ঘেন্নায় সুলতান সেই রাতেই ঐ রক্ষসীকে রাজ্য থেকে নির্বাসন দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু উজিরের অনুরেধে ঐ নিষ্ঠুর কাজ থেকে বিরত হলেন সুলতান।

পরের বছর আবার ঐ একই রকম ঘটনা ঘটল। এবারও সুলতান সংবাদ পেলেন, তাঁর বিবির একটা মরা বিড়াল ছানা হয়েছে। সংবাদটা শুনেই তো সুলতান মহা খাপ্পা। তিনি ছোট বেগমকে এই মারেন তো সেই মারেন। এবার আর সুলতান দেখতেও চাইলেন না। তবু বড় বোনেরা চোখের জল ফেলে বিড়াল ছানাকে না দেখিয়ে ছাড়ল না। তারপর সুলতানকে স্তোক বাক্য দিয়ে বলল—দুঃখ করবেন না জাঁহাপনা। জন্ম মৃত্যু বিবাহ মানুষের হাতে নয় খোদার হাতে। নইলে মানুষ-এর গর্ভে কখনও কি বিড়াল ছানা জন্মায়। এ সবই মালিকের···

ওদের কথা শোনার মত সুলতানের মানসিক অবস্থা নয়। এবার তাঁকে ঠাণ্ডা করতে উজিরকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হল।

বার বার তিন বার। এবারও ছোট বেগমের গর্ভে এসেছে একটা মনা ইঁদুর। সুলতান সংবাদ শুনে অসম্ভব রেগে গেলেন। বেগম কখনই নয়। সে নিশ্চয় কোন পিশাচিনী। এখনই ওকে মৃত্যু দণ্ড দিতে হবে। তা না হলে দেশের ও দশের অমঙ্গল অবসম্ভাবী। এবারও উজির এসেছিলেন সুলতানকে অনুরোধ জানাতে। কিন্তু সুলতান তাঁকে আর কোন আমলনই দিলেন না। অবশেষে কাজি সাহেব বললেন— ব্যাপারটা ঠিকমত তদন্ত না করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া সুলতানের অন্যায় হবে। কারণ তিনি ছোট বেগমকে যে মনুষ্যরূপী পিশাচিনী বলে সন্দেহ করছেন তা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সুলতানকে সবুর করতে হবে। এমন অবস্থায় রাণীকে কারারুদ্ধ করে রাখাই আইনের বিধান।

আইনের বিষয়ে কাজীর উপর সুলতান কিছু বলতে পারেন না। কাজেই শেষ পর্যন্ত ছোট রাণীকে অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী করে রাখা হল।

এবার বড় বোনদের হিংসা চরিতার্থ হল। তারা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

প্রথম বারের মত দ্বিতীয় বারের ছেলেটিকেও ওরা মাটির হাঁড়িতে করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। তৃতীয় বার রাণী সাহেবার আর ছেলে হয় নি, হয়েছিল সুন্দর একটি মেয়ে। তারও ভাগ্য ঐ একই সূত্রে বাঁধা। সুতরাং তাকেও ভাসতে হল হাঁড়িতে করে। প্রত্যেক-বারই কিন্তু ঐ হাঁড়িগুলে, নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে বাদশার বাগান বাড়ির ঘাটে এসে ভিড়েছিল। প্রতিবারই হাঁড়িগুলো বাগানের মালীর দৃষ্টিতে পড়েছিল। নিঃসন্তান মালী অতি যত্নে ছেলেমেয়েগুলোকে জল থেকে তুলে নিয়ে পিতার স্নেহে লালন পালন করতে লাগল।

ক্রমে মালী বৃদ্ধ হ'ল। ছেলেমেয়েগুলোও লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠল। সুখে বসবাস করার জন্য তাদের তৈরী করে দিল সুন্দর একটা বাড়ি। তারপর একদিন বৃদ্ধ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চির দিনের মত ওদের ছেড়ে পরপারে চলে গেল। মা হারিয়েছে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, এতদিনে পিতাকেও হারায় তারা। তাই কয়েকটা দিন ওদের

শুধু চোখের জল ফেলেই কাটল। তারপর এক সময় ওরা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। মালী ওদের সুন্দর নামকরণ করেছিল। প্রথম ছেলের নাম বাহমন, দ্বিতীয়টির নাম পরভেজ আর মেয়ের নাম পরীজাদী।

একদিন দুইভাই বেরিয়েছে শিকারে। বাড়ীতে পরীজাদী একা। এমন সময় এক বৃদ্ধা ভিখারিণী এসে মাত্র একটা রাতের মত ওর কাছে আশ্রয় চাইল। পরীজাদী পরম আদরে ভিখারিণীকে ঘরে এনে আশ্রয় দিল আর পেট পুরে দামী দামী সব খাদ্য খাওয়াল। রাতের আহার শেষ হলে পরীজাদী বৃদ্ধার সঙ্গে নানা গল্পে মেতে উঠল। কথায় কথায় বৃদ্ধা বলল— তোমাদের দেখছি কোন অভাব নেই। শুধু তিনটি জিনিসের অভাব। কথা বলা পাখি, গান গাওয়া গাছ আর সোনার রঙের জল। এই তিনটি জিনিস জোগাড় করতে পারলে তোমাদের বাড়ি হত একেবারে সর্বাঙ্গ সুন্দর।

বৃদ্ধার কথা শুনে পরীজাদী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে— কোথায় গেলে জিনিসগুলো পওয়া যাবে?

—অ-নে-ক দূরে। কত মানুষ সেই সব জিনিস আনতে প্রাণ খোয়াল আর তুমি তো সামান্য একজন মেয়ে। তোমার কথা ছেড়েই দাও। ভাইরাও তো শুনেছি ছেলে মানুষ। কাজেই ওগুলোর আকাঙ্ক্ষা না করাই ভাল।

বৃদ্ধার কথা শুনে পরীজাদী আরো কৌতূহলী হয়ে উঠে। সে বৃদ্ধাকে চেপে ধরে জানতে চায় জিনিসগুলো কোথায় গেলে পাওয়া যাবে।

বৃদ্ধা তখন বাধ্য হয়ে অনেক ভেবে শুরু করল—ঐ অদ্ভুত জিনিসগুলো ভারত ও পারস্যের সীমান্তর কোন একটা পাহাড়ের ধারে। এখান থেকে কুড়ি দিন একভাবে পুব-মুখো ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে পথি পার্শ্বে এক বৃক্ষের তলায় একটা ফকিরকে দেখতে পাওয়া যাবে। সমস্ত চুল দাড়ি তার সাদা। দেহের লোমগুলো পর্যন্ত তার পেকে সাদা হয়ে গেছে। সবাই তাকে সাদা ফকির বলে। একমাত্র সে-ই ঐ আশ্চর্য বস্তুগুলোর সন্ধান দিতে পারে!

বৃদ্ধা সকাল হতে চলে গেল। কিন্তু পরীজাদীর মন থেকে আর

চিন্তাটা গেল না। সে ঐ একই কথা ভাবতে ভাবতে আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করল। চেহারা হল বিশ্রী। চোখে পড়ল কালি।

পরীজাদীর ভাইরা ফিরে এল একদিন তারা বোনের অবস্থা দেখে চমকে উঠল। এ কী হয়েছে তার চেহারা! বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দুই ভাই জিজ্ঞেস করল—তোমার শরীর এত খারাপ হল কী করে? আর তোমাকে এত চিন্তান্বিতই বা দেখাচ্ছে কেন?

খানিক চুপ করে পরীজাদী বলল—শরীর আমার মোটেই খারাপ না। তবে সাংঘাতিক একটা চিন্তায় পড়েছি আমি। আমার একটা দাবি পূরণ করতে হবে তোমাদের।

—ব্যাপারটা বলেই ফেলো না আগেই! দুই ভাই উদগ্রীবভাবে পরীজাদীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

পরীজাদী ভাইদের ধীরে ধীরে বৃদ্ধার মুখে শোনা কাহিনীটা বলে অনুরোধ করল ওরা যেন ঐ তিনটি জিনিস যেমন ভাবে হোক তাকে এনে দেয়। স্নেহের বোনটির মুখে হাসি ফোটাতে পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই যা ওরা মুখ বুঁজে না করতে পারে। স্থির হল, বাহমানই প্রথমে যাবে। ঘোড়া ছুটাতে ওর জুড়ি মেলা ভার। আর সাহসেরও অভাব নেই ওর। ও একাই নিয়ে আসবে ঐ গান গাওয়া গাছ, কথা বলা পাখি ও সোনার মত জল।

একভাবে কুড়ি দিন ঘোড়া ছুটিয়েছে বাহমান। রাত্রে অবশ্য পথের ধারের সরাইখানায় অথবা তা না পেলে কোন গাছের ডালেই শুয়ে রাত কাটিয়েছে। শেষ দিন যখন সূর্যমামা পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছেন ঠিক তখনই বাহমান সেই সাদা ফকিরকে গাছ তলায় দেখতে পেল। হুবহু মিলে যাচ্ছে বর্ণনার সঙ্গে। ফকির তখন ধ্যানমগ্ন। বাহমান শান্তভাবে ফকিরের পাশে অপেক্ষা করতে লাগল।

ফকির সাহেবের ধ্যান ভঙ্গ হতে বাহমান মনের ইচ্ছা প্রকাশ করল তাঁর কাছে। সব শুনে তিনি বললেন—তুমি যে জিনিসের সন্ধানে এসেছ তা তো মানুষের নাগালের বাইরে। তার উপর তোমার বয়স অল্প। কাজেই ও পথে পা বাড়াতে যেও না। কত সাহসী মানুষ এর

আগে গেল আমার কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে কিন্তু তাদের কেউ আর ফিরে এল না। তুমি বাবা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

—ফিরে যাব বলেই কি এতটা পথ শুধু শুধু কষ্ট করে এসেছি ফকির সাহেব? দয়া করে শুধু আমাকে পথটা বলে দিন।

বাহমানের বার বার অনুরোধে ফকির অবশেষে ওর হাতে একটা লোহার গুলি দিয়ে বললেন—গুলিটা সামনের দিকে ছোড় তারপর ওর পিছু পিছু ছুটে যাও। গুলিটা দেখবে সেই পাহাড়ের কোলে গিয়ে থেমেছে। সেই পাহাড়ের মাথায় উঠতে হবে। সেখানে উঠে দেখতে পাবে খাঁচা বন্দী একটা টিয়া? এটাই হল কথা বলা পাখি। ওর কাছেই পাবে বাকী ছুটো জিনিসের সন্ধান। আর যাবার সময় সারা পথে একটি বারও পেছন ফিরে তাকাবে না। কোন কিছুতে ভয় পেও না। ঐ পাহাড়ের উপর অজস্র রাজা বাদশার মৃতদেহ পাথর হয়ে রয়েছে। ভয় না পেলে ওরা কিন্তু তোমায় ভুলেও স্পর্শ করবে না।

ওদের প্রেতাত্মাদের বিকট গর্জন আর ভয়াল চেহারা দেখে যদি একবারও পিছন ফিরেছ তবেই তোমাকেও ঐ রকম পাথর হয়ে যেতে হবে।

বাহমান ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চলল গুলির পেছনে পেছন। অবশেষে পৌছল সেই পাহাড়ের তলদেশে। বাহমান দেখল পাহাড়ের নিচে এখানে সেখানে অসংখ্য মানুষ ঘোড়া পাথর হয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে সাবধানে ও উঠতে শুরু করল পাহাড়ের উপর। কোথা থেকে অসংখ্য মানুষ এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল। ফকিরের নির্দেশ মত বাহমান পাহাড়ের প্রায় অর্ধেকটা কোন দিকে না তাকিয়ে উঠে এসেছে। হঠাৎ মানুষের চিৎকার এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে মনে হল সমস্ত পাহাড়টাই বুঝি চোখের নিমেষে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভয়ে বুক ত্বরু ত্বরু করতে লাগল বাহমানের। তার বেশী উঠতে সাহস হল না? নামবার জন্য পেছন ফিরতেই বাহমান ওর ঘোড়া শুদ্ধ পাথর হয়ে গেল।

দিন কেটে যায়। বড় ভাই আর ফেরে না। ভাই-বোন তুজনেই চিন্তিত হয়ে ওঠে। অবশেষে পরভেজও একদিন ঐ পথে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু ঐ একই পরিণতি ঘটল ছোট ভাই পরভেজের ভাগ্যেও। একলা পরীজাদী ভাই এর পথ চেয়ে বসে থাকে। কিন্তু কোথায় কী। তুটি ভাই আর ফিরল না। অবশেষে পরীজাদী একাই বেরিয়ে পড়ল সেই পথে পুরুষের ছদ্ম বেশে। দীর্ঘ বিশ দিন ঘোড়া ছুটিয়ে পরিজাদী একদিন এসে পৌঁছল সেই ফকির সাহেবের কাছে।

কিন্তু ফকিরের কাছে পরীজাদীর প্রকৃত পরিচয় গোপন রইল না। ভাইদের মত সেও তুর্গম পথে যাবার উদ্দেশ্য ফকিরের কাছে জানিয়েছিল। সব শুনে তিনি বললেন—তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়েছি মা। আজ অবধি ঐ তিনটি জিনিসের জন্য অনেক বীর পুরুষই আমার কাছে এসেছিল কিন্তু কেউ-ই সফল হতে পারে নি। সকলেই পাথর হয়ে গেছে। কাজেই এ কাজ তোমার নয়। তাদের মত বীর আর সাহসী পুরুষদের পক্ষে যখন ঐ তিনটি জিনিস সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি তখন তোমার মত একটি নারী যে কিছু করতে পারে তা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। এ পণ তোমায় ছাড়তেই হবে।

কিন্তু ফকিরের সব চেষ্টা নিষ্ফল হল। পরীজাদীকে ফেরান গেল না। অবশেষে ফকির চোখের জলে ওকে বিদায় জানালেন। ফকিরের দেওয়া লোহার গুলির পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে পরীজাদী সেই পাহাড়ের নিচে এসে পড়ল। পরীজাদী শুনেছে পাহাড়ে উঠবার সময় ভূত-প্রেতের বীভৎস চিৎকার শুনে সকলে ভয় পেয়ে ফিরে আসতে গিয়েই পাথর হয়ে গেছে। সুতরাং ও ঠিক করল কানে ভাল করে তুলো গুঁজে পাহাড়ের উঠবে যাতে কোন শব্দই কর্ণগোচর না হয়। তার মনের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ও ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। পরীজাদী পাহাড়ের চূড়োয় উঠে এল।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে কথা বলা পাখিটিকে খুঁজে নিতে মোটেই কষ্ট হল না। সোনার খাঁচার মধ্যে থেকে সে নিজেই বলল—কে গো তুমি মহীয়সী নারী? আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

পাখিটার দিকে পরীজাদী হাসি মুখে তাকিয়ে বলল—তুমিই তাহলে কথা বলা পাখি।

—হ্যাঁ। তুমি ঠিকই ধরেছ। আজ হতে আমি তোমার বান্দা। কি করতে হবে বল?

পাখিটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে পরীজাদী বলল—আমি তো তোমার কাছেই এসেছি বহু দূর দেশ থেকে। তোমার কাছে আমার অনেক জিজ্ঞাসা আছে। প্রথমে বল কোথায় গেলে পাব সেই গান গাওয়া গাছ আর সোনার বরণ জল।

পাখির কথামত পরীজাদী সহজেই একটা পাত্রে সোনার রঙের জল আর গান গাওয়া গাছের একটা শাখা সংগ্রহ করে নিল। তারপর পাখির নির্দেশে একটা পাত্র পূর্ণ মন্ত্রপূত জল পাহাড় থেকে নামার সময় দুধারের পাথরগুলোর গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগল। আর অমনি ঐ জলের স্পর্শে প্রাণ ফিরে পেয়ে সবাই পরীজাদীকে ধন্যবাদ জানাতে লাগল। ওরা বেঁচে উঠে যে যার দেশে ফিরে গেল। তারপর দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ও চলল সাদা ফকিরের কাছে। কিন্তু গাছ তলায় গিয়ে অবাক হয়ে দেখল সেখানে ফকির নেই। অনেক খুঁজেও তাঁর হদিস মিলল না।

অবশেষে ওরা ফিরে চলল দেশে। দেশে ফিরে কথা বলা পাখির সোনার খাঁচাটা বাগানের একটা সুন্দর জায়গায় টাঙিয়ে রাখল। গান গাওয়া গাছের শাখাটা পুঁতলো বাগানের একেবারে মাঝখানে। আর বাড়ির সম্মুখে একটা শ্বেত পাথরের সামনের চৌবাচ্চা তৈরী করে তাতে ঢেলে দিল সেই সোনার বরণ জল। সমস্ত বাড়িটা দামী সুন্দর সুন্দর আসবাব পত্রে সজ্জিত করা হল। তারপর থেকে দুই ভাই আর এক বোনের দিন বেশ আনন্দের মধ্য দিয়ে কাটতে লাগল। ওদের ঐ আশ্চর্য বাড়ির খবর লোক মুখে দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল রাজ্যের এক কোণ থেকে আরেক কোণে। দলে দলে দর্শনার্থীরা ভিড় করতে শুরু করল কথা বলা পাখি, গান গাওয়া গাছ আর সোনার বরণ জল দেখার জন্য।

এদিকে পাখি নানা রকম কথা বলে। একদিন ও পরীজাদীকে

ডেকে বলল—এ বাড়ির খবর দেশের সবাই জানে। একবার একদিন সুলতানকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে আশ্চর্য জিনিসগুলো দেখিয়ে দাও।

পরীজাদী মনোযোগ দিয়ে শুনলো পাখির কথা। কারণ এখনও পর্যন্ত সমস্ত কাজই ও কথা বলা পাখির নির্দেশে করেছে। তাতে ওদের লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় নি! ও পাখি আসলে সাধারণ কোন পাখি নয়, ও হল একজন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ। কাজেই কোন জিনিসই ওর অজানা নয়!

অবশেষে একদিন দুইভাই পাখির কথামত রাজ দরবারে গিয়ে উপস্থিত হল। ওদের সুন্দর চেহারায় বৃদ্ধ সুলতান মুগ্ধ। তিনি বার বার ভাবতে লাগলেন, ছোট বেগমের যদি কুকুর বেড়াল না হয়ে এদের মত ছেলে হত তাহলে কী ভালই না হত! সুলতানের ইচ্ছে হল দুহাতে কাছে টেনে নেন।

ওরা সুলতানকে সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করে দাঁড়াল। তারপর বিনীতভাবে বলল—আমরা আপনার বাগিচার মালীর ছেলে। বাবা মারা গেছেন। তাঁর অশীর্বাদ আর আপনার দয়ায় ভালভাবেই আমাদের দিন কেটে যাচ্ছে। আজ এসেছি আপনার কাছে একটা আর্জি নিয়ে।

—বল তোমাদের জন্য কী করতে হবে?

—আমাদের বাড়িতে কয়েকটি আশ্চর্য বস্তু আছে! আপনি ছাড়া দেশের প্রায় সকলে দেখে এসেছে। জাঁহাপনা যদি একবার গরীব-খানায় পদধূলি দেন তো···

—বেশ, তাই যাব তোমাদের বাড়িতে।

বাড়িতে ফিরেই ওরা সুসংবাদ জানাল পরীজাদী আর পাখিকে। পাখি সব শুনে বলল—সুলতানের অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হবে না। তাঁর আহারের ব্যবস্থা করতে হবে ভাল ভাল খাদ্য সমগ্রী দিয়ে। তাতে থাকবে একটা বিশেষ ব্যঞ্জন। শশা আর মুক্তোর ঝোল।

—সে আবার কী জিনিস! পরীজাদী অবাক হয়ে যায়।

এটা একটা নূতন খাদ্য হলেও সুলতানের খুব ভাল লাগবে। মুক্তোর জন্য কোন চিন্তা নেই। বাগানের ঈশান কোণে যে তেঁতুল গাছটা আছে তার তলায় খুঁড়লে প্রচুর মুক্তো পাবে।

আজ পর্যন্ত ওরা পাখির কোন কথাই অমান্য করে নি। এবারও ওরা তার কথামত তেঁতুল গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে প্রচুর মুক্তো পেল। শেষ পর্যন্ত তাই দিয়ে মুখরোচক ঝোলও রাঁধা হল।

সুলতান গান গাওয়া গাছ আর সোনা বরণ জল দেখার পর এসে দাঁড়ালেন পাখির খাঁচার সামনে। খাঁচার সামনে দাঁড়াতেই পাখি বলে উঠল—সেলাম রাজামশাই। পাখির মধুর কণ্ঠ শুনে সুলতান চমকে উঠলেন। তারপর পারিষদদের নিয়ে আহারে বসলেন। ইতিমধ্যে তিনি দুই ভাই এর সঙ্গে কথা বলে আশ্চর্য জিনিসগুলোর খবরাখবর নিয়েছেন আর এও জেনেছেন এগুলো ছোট বোন পরীজাদী না থাকলে আর সম্ভব হত না। খেতে বসে তিনি পরীজাদীকে দেখলেন। ওকে দেখে মনটা তাঁর হুহু করে উঠল। আল্লাহ্ সদয় থাকলে তাঁরও আজ অমনি একটি সুন্দরী মেয়ে থাকত!

খেতে বসে সর্বপ্রথম সুলতানকে মুক্তোর ঝোল পরিবেশন করা হল। ঝোল দেখে তো তিনি অবাক! পরীজাদীর দিকে তিনি বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে তাকালেন। ও কিছু বলার আগে পাখি বলে উঠল—এতে আশ্চর্য হবার মত কিছু নেই। আপনি এর চেয়ে আশ্চর্য বস্তু দেখেছেন ইতিপূর্বে কিন্তু তখন মোটেই অবাক হন নি।

—কি বল তুমি? এর চেয়ে আশ্চর্য জিনিস পৃথিবীতে আছে কী?

—আছে নিশ্চয়ই। তা না হলে মানুষের পেটে কুকুর, বিড়াল আর ইঁদুর জন্মাতে দেখেও তো আপনি একবারও অবাক হন নি! একবারও কি ভেবেছেন ওটা অসম্ভব?

পাখির কথায় সুলতানের চৈতন্য উদয় হল। তিনি জানতে চাইলেন তাঁর ছোট বিবির জীবজন্তু প্রসব করাটা মিথ্যা কি না।

পাখি চিৎকার করে বলল—সব ভাঁওতা। ছোট রাণীর গর্ভে মোটেই জীবজন্তু হয় নি। ওগুলোর জন্য দায়ি ওর বড় দুই বোন! ওরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে ঐ জন্তুগুলো দেখিয়েছিল। আসলে আপনার ছোট বিবি প্রথমে দুবারে দুটি পুত্র ও শেষবারে একটি কন্যা প্রসব করেছিলেন।

অনুশোচনায় সুলতানের মাথা হেঁট হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তিনি

কোন কথা বললেন না। তারপর একসময় অতিকষ্টে বললেন—তারা কোথায় আছে আর কেমন আছে, বলতে পার কী?

—তারা ভালই আছে জাঁহাপনা। আনন্দেই আছে। আপনার বাগিচার মালী তাদের কুড়িয়ে পেয়ে লালন-পালন করে মানুষ করে তোলে। তারপর একদিন তাকে খোদা ডেকে নিলেন তাঁর কাছে। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা আজও তারই বাড়িতে···পাখির কথা শেষ হল না। বাহমন, পরভেজ আর পরীজাদী একসঙ্গে চমকে উঠল। তাহলে কি ওরাই রাজার হারিয়ে যাওয়া পুত্র কন্যা! ওদের মনের কথা বুঝতে পেরে পাখি বলে উঠল—হ্যাঁ জাঁহাপনা এই ছেলে-মেয়েগুলোই আপনার সেই তিন ছেলেমেয়ে।

সুলতান আহার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বাহমন, পরভেজ ও পরীজাদীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলেন। তারপর পাল্কী নিয়ে সুলতান লোক পাঠালেন কারারুদ্ধ ছোট বিবিকে নিয়ে আসার জন্য।

তারপর একদিন কারাগারের শূন্য কক্ষে পুরে দেওয়া হল ছোট রাণীর বড় দুই বোনকে ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।

জেলে ও দৈত্যের গল্প

বাগদাদ্ শহরের উপকণ্ঠে এক জেলে বাস করত। রুগ্না স্ত্রী আর তিনটি নাবালক সন্তান নিয়ে ছিল তার সংসার। গরীবের সংসার। দিনের অর্ধেক সময় তাদের অনাহারে কাটে। সংসার চালাবার জন্য মাছ ধরা জাল একমাত্র সম্বল। ঐ জাল দিয়ে শহরের আশে পাশের খাল বিলে, নদীতে সমুদ্রের তীরে তীরে জেলে মাছ ধরে বেড়াত। কোন দিন জালে মাছ পড়ত আবার কোনদিন পড়ত না। যেদিন মাছ পেত—সেদিন বাজারে মাছ বিক্রি করে কষ্টে সৃষ্টে জেলে তার সংসার চালাত আর যেদিন মাছ পেত না সেদিনটা অনাহারে কাটাতে হত। জেলে গরীব হলেও মোটেই সে লোভী ছিল না। মাত্র চার বার সে জাল ফেলত প্রতিদিন। তাতে যা মাছ উঠত তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যেত।

একদিন সে সকালের নামাজ পড়া শেষ করে সমুদ্র তীরে মাছ ধরতে গেল। প্রথম বার জাল ফেলতে জালটা বেশ ভারি ঠেকল। জেলে খুব খুশি হয়ে উঠল। সে ভাবল জালে নিশ্চয় বড় মাছ ধরা পড়েছে। আস্তে আস্তে জাল টেনে তুলল ড্যাঙায়। কিন্তু জালের মধ্যে মাছের বদলে সে একটা মরা গাধা দেখে খুব অবাক হয়ে গেল। ফুলে গাধাটা একেবারে ঢোল হয়ে গেছে।

বিষণ্ন মনে জেলে এবার আরো খানিকটা দূরে জাল ফেলল। এবারও জালটা বেশ ভারি ঠেকল। এবার খোদা নিশ্চয় তার দিকে মুখ তুলে চাইবেন। সে জালটা ধীরে ধীরে টেনে তুলল। কিন্তু এবার উঠল ঝিনুক ভর্তি একটা ভাঙা ঝুড়ি। তৃতীয় বার জাল ফেলেও সে একটা মাছ সংগ্রহ করতে পারল না। খোদা নিশ্চয় আজ তার উপর নারাজ! বউ ছেলে নিয়ে কি আজ তাকে উপবাসী থাকতে হবে? নতজানু হয়ে কায়মনোবাক্যে খোদাকে স্মরণ করতে লাগল। সে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাল, তিন তিনবার তার জালে একটাও মাছ দেন নি—

এবার যেন শেষ বারে তার জালে কিছু মাছ দেন যা বিক্রি করে সে আহার জোগাবে তার স্ত্রী পুত্রের মুখে।

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সে চতুর্থ বার জাল ফেলল সমুদ্রের বুকে। এবারও জাল বেশ ভারি মনে হল। খোদা এবার নিশ্চয়ই তাকে বিমুখ করবেন না। জেলে ধীরে ধীরে তার জাল টেনে তুলল। জালের সঙ্গে উঠে এল একটা তামার মুখ বন্ধ কলসি। জেলে ভাবল খোদা যা দিয়েছেন তাই ভাল। এটাকে বাজারে বিক্রি করে যা পয়সা পাবে তাতে সংসার চলে যাবে! কলসিটা কিন্তু বেশ ভারি। প্যাঁচ কাটা ঢাকনা দিয়ে মুখটা শক্ত করে আঁটা। ঢাকনার উপর প্রাচীন পার্শী ভাষায় কি যেন লেখা। জেলে অনেক চেষ্টা করেও তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না। কি আছে ওটার মধ্যে? জেলে কৌতূহলী হয়ে উঠল। খোদার ইচ্ছে হলে চাই কী এটার মধ্যে হাজার হাজার মোহরও থাকতে পারে! কলসির ঢাকনাটা ধরে খানিকটা টানা হ্যাঁচড়া করতেই কলসির মুখ দিয়ে খানিকটা কালো ধোঁয়া নির্গত হল। দেখতে দেখতে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী একটা বিরাটাকার দৈত্যের রূপ ধারণ করল। দৈত্য করজোড়ে আকাশ পানে তাকিয়ে বলল—দয়াময় সুলেমান! প্রভু এবার আমায় মাফ কর। আর কখনও জীবনে তোমার কথা অমান্য করব না।

দৈত্যকে দেখে তো জেলের অক্কা পাবার অবস্থা। কিন্তু তার কথা শুনে হাসিও পেল খুব। ওর হাসি শুনে দৈত্য জেলের দিকে তাকিয়ে বলল—কে রে তুই? হাসছিস কেন?

—হুজুর হাসি পাচ্ছে আপনার কথা শুনে। বাদশা সোলেমান মারা গেছেন প্রায় দু হাজার বছর আগে, আর আজ আপনি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছেন। এ কথা শুনলে কার না হাসি পায়?

—হাসি পায়? তবে দেখাচ্ছি মজা তোকে। আমার সঙ্গে মসকরা করলে তোকে খুন করব।

—তা খুন করবেন বৈ কি! আজ আপনাকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করলাম কিনা! কৃতজ্ঞতার বালাই কি তোমাদের নেই?

—কি বললি ? তুই আমায় উদ্ধার করেছিস জল থেকে ? তবে তো তোকে খুন করবই—এ যে আমার প্রতিজ্ঞা।

—আমার কথার শুধু একটা জবাব দিন। পৃথিবীতে উপকারীর কি এই পরিণাম ?

—হ্যাঁ। আমার কথা শুনলেই সব বুঝতে পারবি।

এই বলে দৈত্য শুরু করল—দু হাজার বছর আগেকার কথা। দাউদের পুত্র সোলেমান তখন প্রবল পরাক্রমশালী বাদশাহ। একবার আমি তাঁর কথা অমান্য করেছিলাম। তার জন্য বাদশাহ আমায় ভয়ানক শাস্তি দিলেন। তামার ঐ কলসির মধ্যে আমাকে বন্দী করে মন্ত্রপূত ঢাকনা দিয়ে কলসির মুখ এঁটে দিলেন। ঢাকনার মুখে মন্ত্রপূত —অক্ষর অঙ্কিত থাকায় ঢাকনা খোলার শক্তি আমার ছিল না। কলসিটা তিনি সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন। তারপর থেকে কলসির মধ্যে বন্দী হয়ে সমুদ্রের তলায় রয়ে গেলাম। তখন প্রতিজ্ঞা করলাম, যে আমায় মুক্তি দেবে—তাকে আমি একশ' ঘড়া মোহর দেব। কেটে গেল কয়েক শত বছর। কেউ এল না আমায় উদ্ধার করতে। তাই দ্বিতীয় বার প্রতিজ্ঞা করলাম, যে আমায় মুক্ত করে দেবে—আমি তাকে একটা দেশের বাদশা করে দেব। তবু কেউ এল না আমায় মুক্ত করতে। অবশেষে বিরক্ত হয়ে তৃতীয় বার প্রতিজ্ঞা করলাম, যে আমায় উদ্ধার করবে তাকে মেরে ফেলব। কাজেই আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে তোকে মরতেই হবে। তবে, তোর প্রতি একটু দয়া করব। তুই যেভাবে মরতে চাইবি আমি তোকে সেই ভাবে মারবো। এবার বল্ তুই কি ভাবে মরতে চাস।

জেলে দেখল, বাঁচার কোন আশা নেই। মরবার সময় মানুষ বাঁচার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করে। জেলেও তাই করল। সে হাত জোড় করে বলল—হুজুর মরতে তো হবেই। তা নিয়ে অবশ্য চিন্তা করছি না। কিন্তু মরবার আগে যদি আমার একটা কৌতূহল নিবৃত্ত করেন তাহলে চিরদিন—

—কি বলবি, বল। দৈত্য হুংকার দিয়ে ওঠে।

—আমার মাথায় একটা কথা হুজুর কিছুতেই ঢুকছে না। ঐ তো ছোট্ট এক ফোটা কলসি আর আপনার এই বিরাট দেহ। আপনার অতবড় শরীরটা কি করে ঐ কলসির মধ্যে এতদিন ছিল, ভেবে কোন কূল পাচ্ছি না। আপনার কথা আমার একেবারেই বিশ্বাস হয় না। কলসির ভিতর আপনি কখনই ছিলেন না। আপনি নিশ্চয় আকাশ থেকে নেমে এসেছেন।

– তাই ভাবছিস বুঝি। দৈত্যরা মানুষের মত মিথ্যা কথা বলে না।--ভাল করে দেখ আমি কি করে কলসির মধ্যে প্রবেশ করছি।

চতুর জেলের ফাঁদে পা দিল দৈত্য। মুহূর্তের মধ্যে আকাশ ছেয়ে গেল কালো ধোঁয়ায়। তারপর সেই ধোঁয়া তীব্র গতিতে ঢুকতে লাগল কলসির ভিতর।

ধোঁয়া মিলিয়ে যেতে কলসির মধ্যে দেখে দৈত্যের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—কেমন, এবার বিশ্বাস হয়েছে তো?

—হ্যাঁ কর্তা, বিশ্বাস কেন হবে না? মুখটাকে ভাল করে আটকে না দেওয়া পর্যন্ত যে ভরসা পাচ্ছি না।

ঢাকনাটা কলসির মুখে ভাল করে এঁটে দিয়ে জেলে বেশ মৌজ করে চেপে বসে কলসির উপর। তারপর প্রাণপণে হাসতে লাগল।

এতক্ষণে দৈত্যের বুদ্ধি খুলল। সে সুর পাল্টে বলল—জেলে ভাই তুমি ঠাট্টাও বোঝ না! আমি কি আর সত্যি তোমাকে মারতাম। উপকার যে করে তাকে কি কেউ কখন মারে?

—ঠাট্টা তামাসা বুঝি বৈ কি আমি। দেখ না কেমন ঠাট্টা করতে করতে কলসি বন্দী করলাম, এবার চল তোকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসি। এবার অ-নে-ক দূরে ফেলে দিয়ে আসব যাতে আর কোন জেলের জালে কোনদিন ধরা পড়তে না হয়! কলসিটা মাথায় নিয়ে জেলে তার ডিঙিতে উঠে বসল।

দৈত্যের এবার বুক দুরু দুরু করতে শুরু করল।

অনেক কাকুতি-মিনতি, অনেক অনুনয় বিনয় চলল। জেলে কিন্তু

কিছুতে ভোলে না। অবশেষে দৈত্য বার বার খোদার নামে প্রতিজ্ঞা করে বলল, জেলে ভাই আমরা দৈত্যরা কথা দিয়ে কথা রাখি। কথা দিচ্ছি জীবনে তোমার কোন অনিষ্ট করব না বরং যাতে সারাজীবন তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাক তার ব্যবস্থা করে দেব। তোমাকে যে মারতে চেয়েছিলাম তা শুধু আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য। আবার যখন বন্দী হয়েছি তখন প্রতিজ্ঞার মেয়াদও ফুরিয়ে গেছে। এবার নতুন করে প্রতিজ্ঞা করছি আমায় যদি মুক্তি দাও তোমার ভাল করব।

দৈত্যের কাতর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত জেলে রাজি হয়ে যায়। তীরে এনে কলসির মুখ খুলে দিল।

দৈত্যটা বেরিয়ে তার আসুরিক পদাঘাতে কলসিটা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল জেলে। এবার হয় তো তার পালা। কিন্তু দৈত্য হাসি মুখে তার দিকে এগিয়ে বলল—ভয় কি? আমি যে কথা দিয়েছি তার কোন নড়চড় হবে না। চল, তোমাকে একটা ভাল জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। সেখানে জাল ফেললেই প্রচুর মাছ পাবে। কিন্তু একবারের বেশী জাল ফেলো না। একবারে যা মাছ উঠবে তাতেই তোমার চলে যাবে। বেশী লোভ করেছ কি মরেছ। শহর ছাড়িয়ে মাঠের উপর দিয়ে অনেকটা গিয়ে পাহাড় ঘেরা একটা ছোট্ট হ্রদ দেখিয়ে দিল দৈত্য জেলেকে।

—এখানেই মাছ ধরবে এবার থেকে। দৈত্য মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

২

আল্লাকে স্মরণ করে ঐ সুন্দর হ্রদে জাল ফেলল জেলে। জালে উঠল চারটে সুন্দর মাছ। তাদের রং লাল, নীল হলদে আর সাদা। এমন অদ্ভুত মাছ জেলে ইতিপূর্বে জীবনে কখনও দেখে নি। বিস্মিত জেলে মাছ চারটে নিয়ে গেল সুলতানের কাছে। মাছ দেখে সুলতান খুশি হয়ে জেলেকে চারশো টাকা পুরস্কার দিলেন।

টাকা পেয়ে জেলে মহানন্দে বাজার করল বাড়ী যাবার পথে।

বউ-এর কাপড় নেই—ছেলেগুলো প্রায় উলঙ্গ। কাপড়ের দোকানে ঢুকে বৌ-এর জন্য শাড়ি আর ছেলেদের জন্য জামাকাপড় কিনল। তারপর গেল মিষ্টির দোকানে। সেখানে ঝুড়ি-ভর্তি দামী দামী সব জিনিষ কিনে মুটের মাথায় করে বাড়ী এসে হাজির হল। বাজারের বহর দেখে আর শাড়ির জেল্লা দেখে জেলে বৌ-এর মুখে আর হাসি ধরে না। ছেলেরাও মহা খুশি।

—কি ব্যাপার তোমার? সারা বাজারটাই মনে হচ্ছে কিনে নিয়ে এসেছ।

—তা আর কি করি বল। সুলতানের কাছে মাছ বেচে চার শো টাকা পেলাম তাই···

চারশো টাকার কথা শুনে জেলে বৌ খুব খুশি। জেলের কাছে আগ্যপান্ত ঘটনা শুনে সে বলল—সবই খোদা তালার ইচ্ছা।

এদিকে সুলতান তাঁর প্রধান খানসামাকে ডেকে মাছগুলোর কালিয়া তৈরি করতে বললেন। খানসামা সুলতানের কথামত খানা তৈরি করতে চলে গেল। কিন্তু মাছগুলো ভাজতে গিয়ে ঘটল এক কাণ্ড।

এক দিক ভাজা হয়ে গেছে। খুন্তি দিয়ে খানসামা যেই মাছগুলোর আর এক দিক ভাজার জন্য উল্‌টে দিল আর অমনি রান্নাঘরের একটা দেওয়াল ফেটে দু'ভাগ হয়ে গেল। অবাক হয়ে ফাটা দেওয়ালের দিকে তাকাতেই খানসামা দেখতে পেল একটা পরমা সুন্দরী পরী দেওয়ালের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে। হাতে তার একটা সোনার দণ্ড। পরী সোজা মাছ ভাজা কড়াইএর কাছে গিয়ে সোনার দণ্ড দিয়ে মাছগুলোকে ঠেলা দিয়ে বলল—প্রতিজ্ঞার কথা তোমাদের মনে আছে তো? মাছেরা গরম তেলের উপর মাথা তুলে বলল—নিশ্চয়ই মনে আছে। তুমি ফিরলে আমরাও ফিরব। তুমি এলে আমরাও আসব আর তুমি গেলে আমরাও যাব। খানসামা অবাক হয়ে ঐ অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে। কিন্তু পরীর কোনদিকেও দৃষ্টি নেই। সে তার সোনার দণ্ডের আঘাতে কড়াইটাকে উল্‌টে দিয়ে দেওয়ালের ফাটলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে

দেওয়ালটা আবার পূর্ববৎ জোড়া লেগে গেল। এদিকে মাছগুলোও যেন কোথায় নিমেষের মধ্যে ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল। খানসামা ব্যাপার স্যাপার দেখে তো একেবারে তাজ্জব।

খানসামা ভয় পেয়ে ছুটে গেল উজিরের কাছে। তাঁকে সমস্ত ঘটনার কথা বলল সে। এবং আরো জানাল যে সুলতান যদি খাবার পাতে মাছ না পান তো তাকে আর আস্ত রাখবেন না। কাজেই উজিরই এখন একমাত্র তার ভরসা। যাইহোক সেদিনটা উজির সুলতানকে নানা কথায় ভুলিয়ে রাখলেন। পরদিন উজির জেলেকে আবার জাল ফেলতে বললেন। জেলে হ্রদে জাল ফেলে একই রকমের চারটে মাছ ধরে নিয়ে এল। এবারও সে সুলতানের কাছে পুরস্কৃত হল। মাছ ভাজার সময় উজির স্বয়ং উপস্থিত রইলেন খানসামার কাছে। মাছের এক পিঠ ভাজা হলে খুন্তি দিয়ে মাছগুলো উল্টে দিতেই ঘরের দেওয়াল আবার দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সেই সুন্দরী পরী তারপর মাছ ও পরীর মধ্যে একই কথোপকথনের পুনরাবৃত্তি হল। আর সঙ্গে সঙ্গে পরী ও মাছগুলো সকলের চোখের সামনে উধাও হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে উজিরের তো চক্ষু চড়কগাছ।

উজিরেব কাছে আদ্যপান্ত ঘটনার কথা শুনে সুলতান ঘটনাটা চাক্ষুষ দেখা স্থির করলেন। আবার ডাক পড়ল জেলের। দ্বিগুণ পুরস্কারের লোভে সেদিনও জেলে নিয়ে এল ঠিক সেই চার রঙের চারটি মাছ।

সুলতানের আদেশে মাছ চড়ানো হল কড়াইয়ে। একধার সহজেই ভাজা হল। তারপর খানসামা যেই না উল্টে মাছগুলো ভাজতে গেল অমনি ঘটল সেই কাণ্ড। দেওয়াল বিদীর্ণ হল, পরী এল, তার সঙ্গে মাছেদের কথা হল তারপর পরী কড়াই উল্টে দেবার পর সকলেই অন্তর্হিত হল। সুলতান ব্যাপার দেখে তো একেবারে স্তম্ভিত। খানিক পরে সুলতানের বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর তিনি উজিরকে বললেন— এতে নিশ্চয়ই কোন একটা রহস্য আছে। এ রহস্য ভেদ করতেই হবে আমাকে।

পরদিন জেলেকে তলব করে পাঠালেন সুলতান। জেলে এলে

তাকে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন—এই সুন্দর মাছগুলো তুমি কোথায় ধরেছ? জেলে উত্তরে সুলতানকে পাহাড় ঘেরা সেই হ্রদের হদিস জানাল। কিন্তু সুলতান কিংবা উজির কেউই ঐ হ্রদের সন্ধান জানতেন না। নগরের এত কাছে এমন একটা সুন্দর হ্রদ আছে সুলতান ইতিপূর্বে কারুর কাছেই শোনেন নি। অথচ জেলের বর্ণনানুযায়ী মনে হচ্ছে জায়গা বেশী দূরেও নয়। সুলতানের রাজ্যের মধ্যে এমন একটা সুন্দর জায়গা আছে এ খবর কেউ রাখেন না। এ বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার।

সব শোনার পর সুলতান আর উজির চললেন জেলের পিছু পিছু ঘোড়ার পিঠে চড়ে সেই হ্রদ দেখতে। পাহাড়ের চূড়ো পেরিয়ে মুক্ত প্রান্তরের ভিতর দিয়ে ওঁরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লেন পাহাড় বেষ্টিত সেই হ্রদের তীরে। আয়নার মত স্বচ্ছ জল টল টল করছে। ফুর-ফুরে বাতাস বইছে। জায়গাটা সত্যি সত্যি খুব রমণীয়। প্রথম দর্শনেই সুলতানের জায়গাটা খুব পছন্দ হল। তাঁবু পড়ল হ্রদের ধারে। কোথা থেকে এল এই আশ্চর্য হ্রদ। রাজধানীর অদূরে এই হ্রদের অস্তিত্বের কথা ইতিপূর্বে তো কেউ কখনও সুলতানকে বলেনি। তাছাড়া সুলতান হ্রদের অদ্ভুত মাছগুলোর কথা ভেবে আরও আশ্চর্য হয়ে যান। প্রত্যেকটা একই মাপের মাছ। চার রঙের চারটি, কমও নয় বেশীও নয়, এমন কি ছোটও নয় বড়ও নয়। জেলেকে তিনি বার বার প্রশ্ন করে জেনেছেন যে, সে একবারের বেশী দুবার হ্রদের জলে কোন দিনও জাল ফেলে নি। এ সব দেখে শুনে সুলতানের চোখে ঘুম নেই।

দিনের বেলাটা তিনি চারিদিকে ঘুরে ঘুরে ভাল করে দেখে নিলেন। কোথাও কোন মানুষের চিহ্ন নেই—নেই কোন বাড়ী ঘর দোরের অস্তিত্ব। চারিদিকে দেখে শুনে সুলতান একসময় উজিরকে বললেন—আজ রাতে আমি একাই গোপনে রহস্য উদ্ধার করতে বেরিয়ে পড়ব। এ কথা যেন তুমি ছাড়া আর কেউ না জানে।

উজিরের বারংবার আপত্তি সত্ত্বেও সুলতান রাতের অন্ধকারে একটি মাত্র তরোয়াল সম্বল করে ছদ্মবেশে তাঁবু থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে

পড়লেন। অনেকক্ষণ ধরে একটানা হাঁটলেন তিনি পাহাড়ী পথ ধরে। তারপর ভোর হয়ে আসছে এমন সময়ে তিনি এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে এসে পড়লেন। ভোরের আবছা আলোয় দূরে একটি কালো মত মস্ত বড় জিনিস সুলতানের চোখে পড়ল। তিনি কৌতূহলী হয়ে হন হন করে সেই দিকে হাঁটতে থাকেন। বস্তুটি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল চোখের সামনে। সুলতান দেখতে পেলেন প্রকাণ্ড একটি কালো পাথরের তৈরি বাড়ি। রাজবাড়ি বলেই মনে হয়।

খোলা তরোয়াল হাতে সুলতান রাজবাড়ির সিংদরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। কোথাও কোন প্রহরী নেই। বিনা বাধায় সুলতান ভিতরে প্রবেশ করলেন। সামনেই একটি প্রশস্থ কক্ষ। দরজাটা ভেজানো। সুলতান মৃদু করাঘাত করলেন দরজায় কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। আবার করাঘাত করলেন তিনি। এবার কিন্তু একটু জোরে। তবু কেউ সাড়া দিল না। তবে কি এ বাড়ি জনমানব শূন্য? সুলতান ভেবে কোন কূল পেলেন না।

অবশেষে তিনি কক্ষের ভিতর প্রবেশ করলেন। সুসজ্জিত কক্ষ। দামী দামী আসবাব পত্রে কক্ষটি সজ্জিত। কিন্তু মানুষের কোন চিহ্ন নেই। একের পর এক সুসজ্জিত কক্ষ পার হয়ে সুলতান এক সময় এসে পড়লেন একটি সুন্দর প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণের চারকোণে চারটি ফোয়ারা—প্রভাত সূর্যের কিরণে ফোয়ারার জল সাত রঙা রামধনু রঙে ঝিল মিল করছে। কি সুন্দর সে দৃশ্য! কিন্তু এমন সুন্দর দৃশ্য দেখার মত কোথাও কোন লোক নেই।

হেঁটে হেঁটে সুলতান খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে একটি শ্বেত পাথরের বেদীর উপর বসে পড়লেন। বসে বসে ক্লান্ত মনে তিনি চিন্তার জাল বুনে চলেছেন এমন সময় নিকটবর্তী একটি কক্ষ থেকে করুণ কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। সুলতান সচকিত হয়ে উঠলেন সেই কান্না শুনে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন কান্নার স্বর লক্ষ্য করে। কে কাঁদে এমন করে এই নিভৃত পুরীতে? সুলতান চিন্তিত হয়ে অগ্রসর হতে থাকেন।

কক্ষদ্বারে দামী মখমলের পর্দা ঝুলছে। পর্দা টেনে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে সুলতান দেখলেন, স্বর্ণখচিত সিংহাসনের উপর একটি অপরূপ সুন্দর যুবক ম্লান মুখে বসে আছে। সুলতান ধীর পদে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করতে যুবক বলল—আমি উঠে গিয়ে আপনার অভ্যর্থনা করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আমি উত্থান শক্তি রহিত।

যুবকের ব্যথাভরা মুখটি আরো করুণ হয়ে উঠল। যুবকের মিষ্টি ব্যবহারে সুলতান খুশি হয়ে বললেন—আমার বিশ্বাস আমি যে রহস্যের সন্ধানে বেরিয়েছি আপনিও তার সঙ্গে জড়িত। আপনি আপনার দুঃখের কারণ জানালে হয় তো কিছু উপকার করতে পারব।

যুবক বলল—আপনার পরিচয় কী? এবং কোন রহস্যের সন্ধানে এখানে এসেছেন জানতে পারি কী?

সুলতান নিজের পরিচয় গোপন রেখে পাহাড় ঘেরা সেই হ্রদের কথা বললেন। আর বললেন চার রঙের চারটি মাছের কথা এবং সুন্দরী পরীর কথা। অবশেষে তিনি জানতে চাইলেন যুবকের পরিচয় আর জনশূন্য পুরীতে তার অবস্থানের কথা।

যুবক চোখের জল মুছে দেহের পোশাক খানিকটা খুলে ফেললেন। বিস্মিত সুলতান দেখলেন যুবকের দেহে বিশ্রী ক্ষত। সদ্য বেত মারার চিহ্ন। রক্ত ঝরে পড়ছে সেই সব ক্ষত বেয়ে। সুলতান আরো দেখলেন যুবকের দেহের উপরের দিকটা মানুষের মত হলেও নিম্নাংশ প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। সুলতানের মন যুবকের কষ্টে ভরাক্রান্ত হয়ে উঠল।

—এবার বুঝতে পারছেন তো কেন আমি উঠে গিয়ে আপনার অভ্যর্থনা করতে পারি নি? যত দিন বাঁচব এমনিভাবেই কেটে যাবে আমার দিন।

—না তা হয় না। কারণ দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। সুখ একদিন আসবেই আপনার জীবনে। এখন আপনার কথা কিছু বলুন যাতে আমি আপনার সাহায্য করতে পারি।

সুলতানের কথায় যুবক তার কাহিনী শুরু করল।

—আমি হলাম বিখ্যাত সুলতান মামুদের পুত্র জয়নাল। সুলতান

মামুদ ছিলেন কৃষ্ণ দ্বীপের বাদশা। কয়েকটি ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে কৃষ্ণ দ্বীপ গঠিত। আজকের সুন্দর ঐ হ্রদ ছিল আমাদের রাজধানী। আর জাদু বিদ্যার বলে সেদিনের রাজপ্রাসাদ আজ হ্রদের গভীরে নিশ্চিহ্ন এবং দ্বীপগুলো পাহাড়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

দীর্ঘ আশি বৎসর রাজত্ব করার পর পিতার মৃত্যু হল। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করলাম আমি। বাদশা হবার কিছুদিন পরে সুন্দরী আমিনা'ক বিয়ে করে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিলাম। আমরা দুজনেই দুজনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। এমনি ভাবে দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর কেটে গেল।

এদিকে যে বিবি প্রতি রাত্রে আমায় ঘুমের ওষুধ মিশ্রিত সরবৎ পান করিয়ে একটা কাফ্রীর কাছে যায় হঠাৎ একদিন তা জানতে পারলাম। আড়াল থেকে দুজন দাসীর গোপন কথাবার্তা শুনে ঘটনাটা বুঝতে পারলাম। প্রথমে তাদের কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভাবলাম ঈর্ষান্বিত হয়ে বুঝি দাসীরা বিবির নামে কুৎসা রটাচ্ছে। দাসীদের এ ব্যাপারে কিছু বললাম না। নিজের চোখে ঘটনাটা দেখব বলে স্থির করলাম।

প্রতি রাত্রেই বিবি শোবার সময়ে আমায় একগ্লাস মিষ্টি সরবৎ খাওয়াত। দাসীদের কথায় জানতে পেরেছিলাম ঐ সরবতেই ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয় বিবি। সেদিনও হাসতে হাসতে বিবি সরবতের গ্লাস হাতে আমার খাটের কাছে এগিয়ে এল। সরবতের গ্লাসটা ওর হাত থেকে নিয়ে নানা গল্প করার ফাঁকে একসময় সরবতটা জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। বিবি এর কিছুই টের পেল না। সে ভাবল আমি বুঝি সরবতটা খেয়ে ফেলেছি। তারপর গল্প করতে করতে আমরা দুজনে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি কিন্তু ঘুমোবার ভান করে নিঃশব্দে মড়ার মত শুয়ে রইলাম। রাত গভীর। বিবিকে দেখলাম সে সুসজ্জিত হয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে বারকয়েক আমার দিকে দেখে নিল আমি সত্যি ঘুমোচ্ছি কি না।

খানিক বাদে আমিও একটা তরোয়াল হাতে বিবিকে নিঃশব্দে

অনুসরণ করে চললাম। বিবি শহর ছাড়িয়ে একটা বস্তিতে প্রবেশ করল। তারপর একটা পুরনো বাড়ির দরজায় করাঘাত করল। ভিতর থেকে পুরুষ কণ্ঠে একজন বলল — এত দেরী হল কেন? ঘরে ঢুকতে দেব না।

— তুমি তো জান আমার কত বিপদ। আজকের মত দরজা খোল। এবার ওকে খুন করে তারপর নিশ্চিন্ত হব। তখন আর দেরী হবে না। একজন সামান্য কাফ্রীর কাছে বিবির মিনতি শুনে সারা শরীর জ্বলে উঠল। যাইহোক কাফ্রী ঘর খুলে দিতে বিবি ঘরের ভিতর প্রবেশ করল। তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল হাতে আমিও হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর অকস্মাৎ ঝড়ের মত ঢুকে পড়লাম। ঘরে ঢুকেই আমার খোলা তরোয়ালের কোপ বসালাম বিবিকে লক্ষ্য করে কিন্তু কি আশ্চর্য বিবির কিছু হলনা। কোপটা গিয়ে পড়ল কাফ্রীর ঘাড়ে।

তারপর ওখান থেকে সোজা চলে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বিবি আমার পাশে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলাম না — যেন কিছুই জানি না। সকালের নামাজ সেরে এসে দেখি বিবি শোকের কৃষ্ণবর্ণের পোশাক পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার শোকের কারণ জিজ্ঞেস করতে সে বললে যে তার বাবার মৃত্যু হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে, ভাই মারা গেছে সর্প দংশনে আর সেই শোকের ধাক্কা সামলাতে না পেরে মাও কয়েকদিন আগে মারা গেছেন। এইমাত্র তার দেশের লোকের কাছে না কি খবর পেয়েছে সে। তাই তার এই শোকাতুর বেশ।

বিবিকে তার শোকের সান্ত্বনা দিলাম। তার দুঃখে আমাকেও দুঃখিত হতে হল। এমনি একটি বছর ধরে চলল শোক পালনের পালা। শেষ পর্যন্ত শোক প্রকাশের জন্য বাড়ীর বাইরে কবরখানায় বিবি তার শোক প্রকাশের জন্য একটি বাড়ীই তৈরি করে ফেলল। নাম তার হল শোক গৃহ। প্রতিদিন বিবি সেখানে গিয়ে শোক প্রকাশ করে। কিন্তু আসলে ঐ আহত কাফ্রীটাকে নিয়ে এসে ওখানে সেবা

যত্ন করত। কিন্তু যাদু বিদ্যা জানা সত্ত্বেও বিবি কাফ্রীটাকে সারিয়ে তুলতে পারল না।

সবই নিরবে সহ্য করে যাই। বিবিকে সব ব্যাপার জেনেও কিছু বলি না। অবশেষে একদিন সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। বিবির মাথা তাক করে একদিন যেই তরোয়াল তুলেছি অমনি সে আমার দেহে মন্ত্রপূত জল খানিকটা ছিটিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে তরোয়ালটা আমার হাত থেকে খসে পড়ে গেল মাটিতে আর আমার কোমর অবধি পাথর হয়ে গেল। সেই দিন থেকে আমার এমন অবস্থা।

—বড় দুঃখের কথা। কিন্তু সেই অদ্ভুত মাছগুলোর বিষয়ে তো কিছু জানা গেল না?

কথা বলতে বলতে যুবক হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই খনিক থেমে সে আবার শুরু করল ক্লান্ত কণ্ঠে—শয়তানী যাদুকরী শুধু আমায় পাথর করে ক্ষান্ত হয় নি সে সমস্ত রাজ্যটাকেই পাহাড়ে পরিণত করল। আর রাজধানীটাকে রূপান্তরিত করল একটা হ্রদে। আর সেই হ্রদের মধ্যে থেকে যে চার রঙের চারটে মাছ উঠতে দেখছেন তারা হল চার রকম জাতের প্রজা—মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী আর ইহুদী। এত সাংঘাতিক ক্ষতি করার পরেও সেই শয়তানীর প্রতিশোধ স্পৃহা আজো মেটে নি। এখনও সে প্রতিদিন সকালে এসে আমার গায়ের জামা তুলে গুনে গুনে একশো বার বেত্রাঘাত করে আর খিল খিল করে হাসে। তখন আমার গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। সেই রক্তের উপর আবার পোশাক চাপা দিয়ে ঠাট্টা করে শয়তানী বলে—রাজ সিংহাসনে বসে রাজ পোশাকে কেমন সুন্দর লাগছে?

গল্প শুনে সুলতান খানিক চুপ করে থেকে বললেন—সেই শয়তানী কোথায় থাকেন জানেন কি?

—জানি। মুহূর্তের জন্য কি ভেবে নেয় যুবক। তারপর আস্তে আস্তে বলে—সে থাকে শহরের উপকণ্ঠে সেই শোকগৃহে কাফ্রীটার পাশে। সকাল হলে শুধু এখানে আসে আমায় বেত্রাঘাত করার জন্য।

সুলতান এতক্ষণে তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে যুবককে নিশ্চিন্ত থাকতে বলে তাঁর জাদু তরোয়াল হাতে সেই শোকগৃহের দিকে এগিয়ে চলেন।

খানিক বাদে সুলতান শোকগৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দুধের মত সাদা বিছানায় শুয়ে রয়েছে অসুস্থ কাফ্রীটা। ঘরের মধ্যে ধূপধুনোর গন্ধ ভুর ভুর করছে। প্রদীপের মৃদু আলো সারা ঘরটা অদ্ভুত রহস্যময় দেখাচ্ছে। সুলতান কোনরূপ ইতস্তত না করে এক কোপে কাফ্রীটার দেহ দুটুকরো কেটে ফেলে পাশের একটা কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন। তারপর তার জামা কাপড় পড়ে সেই বিছানায় শুয়ে পড়ে একটা চাদরে পা থেকে মুখ পর্যন্ত ঢেকে নিলেন।

এদিকে সেই শয়তানী সকালে যুবককে একশো ঘা বেত মারার কাজ শেষ করে ফিরে এল শোকাগারে। এসে কাফ্রী বলে ভুল করে চাদর ঢাকা সুলতানকে বলল—আজ যে মুখখানাও ঢেকে ফেলেছ বন্ধু। কতদিন আর এমনি মুখ বুজে থাকবে ; বল ?

সুলতান মুখাবৃত অবস্থাতেই কাফ্রী ভাষায় বললেন—তুই পাপীয়সী। এ জগতে খোদা ছাড়া আর কে বন্ধু আছে ?

কাফ্রীর মুখে কথা ফুটেছে শুনে জাদুকরী মহা খুশি। সে হেসে বলল—সত্যি তাহলে এ্যাদ্দিনে তোমার অসুখ সারল ? এতদিন বাদে তোমার মুখে আবার কথা ফুটল ? আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও একবার।

সুলতান কর্কশ কণ্ঠে বললেন—না কখনই না। তুই হীন। নিষ্ঠুর। তুই রোজ সকালে তোর স্বামীকে বেত্রাঘাত করিস। আর সেই আঘাত আমার পিঠে কেটে কেটে বসে যায়। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠি। ঐ নির্দোষ মানুষটি দিনরাত্তির আমায় অভিশাপ দেয়। তার অভিশাপেই আমি রোগমুক্ত হচ্ছি না।

—আদেশ কর প্রভু কি করতে হবে ?

—যা এই মুহূর্তে তোর স্বামীকে ভাল করে আয়। তবেই আমার রোগ সারবে।

শয়তানী ছুটল তার স্বামীর কাছে। মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে তাকে সুস্থ করে বলল—যা তোকে বাঁচিয়ে তুললাম আবার। এখনই এ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যা তা না হলে এবার আর রক্ষে রাখব না।

প্রাণ ফিরে পেয়ে যুবক জয়নাল কোন কথা না বলে নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে পড়ল।

বিবি ছুটে এল শোক গৃহে। করজোড়ে কাফ্রীর ছদ্মবেশী সুলতানকে বলল—তোমার আদেশ পালন করেছি। এবার আমার দিকে মুখ ফিরে তাকাও।

—না তা হয় না। এখনও সম্পূর্ণ আমি ভাল হয়ে উঠিনি। এ সবই তোর কুকর্মের ফল।

—আদেশ হোক প্রভু।

—এই নগর যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে দিবি আর নিরপরাধ মানুষগুলো যারা হ্রদে জলে মাছ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারাও আমায় কম অভিশাপ দেয় না। কাজেই তাদেরও পূর্বজীবন ফিরিয়ে দাও। ওদের মুক্তির পর তোমার সঙ্গে হাসব, খেলব আর কথা বলব অজস্র।

খুশি মনে বিবি ছুটল সেই হ্রদের তীরে। মন্ত্র পড়ে নগর, দুর্গ, প্রাসাদ যেখানে যেমন ছিল সব পূর্বের মত করে তুলল। মাছেরা সব মানুষ হয়ে যে যার কাজ করতে শুরু করল। কোথায় গেল সেই পাহাড় আর কোথায় বা সেই হ্রদ। জাদুকরী আনন্দে আটখানা হয়ে ফিরে এল ছদ্মবেশী সুলতানের কাছে।

—তোমার আদেশ প্রভু সবই পালিত হয়েছে। এবার উঠ।

—সব ঠিকমত পালন করেছ তো? ধীরে ধীরে কাফ্রীর কণ্ঠে প্রশ্ন ভেসে এল।

—হ্যাঁ প্রভু।

—এবার আমি খুশি। আমায় হাত ধরে তোল।

বিবি হাত বাড়িয়ে সুলতানের একটা হাত ধরতেই হাতের এক টানে বিবি ছিটকে পড়ল। তারপর সুলতানের যাদু তরোয়ালের ঘায়ে বিবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। শেষ হল তার জাদুর খেলা।

এবার কৃষ্ণদ্বীপের যুবরাজকে অনেক অনু স্থানের পর খুঁজে বার করলেন ছদ্মবেশী সুলতান। তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন— তোমার রাজ্য ও রাজধানী যেমন ছিল আগে ঠিক তেমনি হয়ে গেছে এখন। তোমার প্রজারা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এবার বল তুমি এখানেই থাকবে না আমার রাজ্যে যাবে?

যুবক কৃতজ্ঞচিত্তে বলল এ সবই আপনার জন্য সম্ভব হয়েছে সুতরাং আপনি থাকুন এর কর্তা হিসেবে, আমি থাকব আপনার সেবক হয়ে।

যুবকের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সুলতান বললেন—আমার কোন পুত্র নেই। আজ থেকে তুমিই আমার পুত্র এ রাজ্য তোমাকেই দান করলাম। এবার সুখে রাজকার্য চালাও। সেই শয়তানীর ভয় আর নেই তাকে আমি নিজের হাতে হত্যা করেছি।